ফুলবর্ষিয়া

LIBRARY
CALCUTTA
EMPLOYEES' UNION
2027
BLOCK 'F' HIDE ROAD

সমরেশ বসু

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা—১২

RR
৮৯১.৪৪৩
মেরেকল/মু

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মাঘ ১৩৬৬

STATE CENTRAL LIBRARY, WEST BENGAL
ACCESSION NO. ম/ ৯০৯৬
DATE 25/8/06

প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক : ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী : গণেশ বসু

প্রচ্ছদ-মুদ্রণ : নিউ প্রাইমা প্রেস

॥ দাম আড়াই টাকা ॥

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ফুলবর্ষিয়া ১
দুই বন্ধু ৩০
সুবাসী ৪৯
পাড়ি ৬৪
জ্বালা ৮৮
বনলতা ১০৮

VOLKART EMPLOYEES' UNION
CALCUTTA.

ফুলবর্ষিয়া

হঠাৎ মেঘের গুড়গুড় শব্দে চমকে উঠল শিউবচন। আচমকা একটা ঝড়ো হাওয়ায় তার ঘামে ভেজা চন্দনে লেপা শরীরটা জুড়িয়ে গেল। সামনের খতিয়ানের পাতাগুলি বেহিসাবীর মত ফড়ফড়িয়ে উঠল হাওয়ায়।

সে মুখ তুলে দেখল, উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কালো মেঘ যেন হাজার ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়ে তীব্র বেগে ছুটে আসছে। কালো ধূলোর মত সে মেঘ আকাশ ছাইছে, হিলিবিলি বিজলীর মালা ঝলকাচ্ছে, সোঁ সোঁ শব্দে মাথা খুঁড়ছে দূরের গাছগাছালি।

শিউবচনের বিস্মিত মুখে ছড়িয়ে পড়ল অসহ্য খুশীর আবেগ। তখনো হিসাবের মাঝ পথে বুড়ো আঙ্গুল তার ক'ড়ে আঙ্গুলের রেখায় ঠেকে ছিল। তাড়াতাড়ি খতিয়ান গুছিয়ে বেঁধে সে উঠে দাঁড়াল। কাল বৈশাখীর আকাশের দিকে তাকাল যেন সে কতদিন পরে তার আরাধ্য দেবতার দেখা পেয়েছে। আচমকা, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দেখল ঝড়ের মাতন লেগেছে গঙ্গার বুকে। আর বেশীদিন নয়; এবার গঙ্গার টলটলে জল হয়ে উঠবে লাল, শুকনো খরো মাটির বুক ভাসিয়ে উঠে আসবে অনেক দূরে, উচুতে এই শিউবচনের নৌকার কাছে। শুকনো ডাঙ্গায় আটকানো নাও ভাসবে, শুরু হবে তার সারা বছরের হাপিত্যেশ করা ব্যবসা, জেলা থেকে জেলায় গ্রাম থেকে শহরে। নাও ভাসবে ইঁট, বালি, টালি, চুন, সুরকী আরও কত কি নিয়ে। বর্ষাকালে যে সব মালপত্র নিয়ে কারবার চলে, সবই।

সে তাকাল তার নৌকার দিকে। আহা, নৌকা তো নয়, মস্ত

বড় একটা বাড়ি বসানো রয়েছে গঙ্গার ধারের মাঠে। বারো জন মাঝি আর দুটো দাড়ি একে সামলায়। গাব ফলের মাড় দিয়ে নিকনো ছই চক্‌চক্‌ করছে। ছই নয়, বাড়ীর ছাদ। শক্ত কাঠের চওড়া পালিশ করা মাস্তুল উঠে গিয়েছে আকাশে। মাথায় তার তে-কোণা লাল নিশান। বজরংবলীর নিশান। বছরে ছ'সাত মাস তার এই নৌকার খোলেই কেটে যায়। বাদ-বাকী সময় নৌকো ভাড়া খাটে। তখন অদূরের ওই সাধুবাবাদের আড্‌ডার কাছে ছোট একটা ছিটে বেড়ার ঘরে সে আশ্রয় নেয়।

আর আছে তার গোটা পঞ্চাশ মাঝারি পিপে। এগুলি সে বারোমাসই ভাড়া খাটায়। কিন্তু আসল ব্যবসা তার নৌকা ভাড়া খাটানো। তাই বর্ষার প্রথম সঙ্কেতে তার মুখে চোখে ঝলকে উঠেছে খুশী। হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে তার ফোগলা দাঁত। গোঁফদাড়িহীন কামানো কালো মুখে রেখায় রেখায় ছড়িয়ে পড়েছে লুব্ধ হাসির ঢেউ। কপালেও হিলিবিলি বিজলীর মতই রেখা এঁকেবেঁকে উঠছে। এ তো মেঘগর্জ্জন নয়, সে শুনছে টাকার ঝনঝনানি।

বয়স হয়েছে শিউবচনের। তার কালো গায়ের লোমে পাক ধরেছে। কুঁচকে গিয়েছে চামড়া। কিন্তু পোষ্টাই হাড়ে তাকে এখনো শক্ত বলে মনে হয়। সব সময় সে ঝুঁকে দাঁড়ায়। চলেও ঝুঁকে। সে জন্য মাথাটা তার নুয়ে থাকে। তাকাবার সময় চোখ দুটো এমন ভাবে তোলে মনে হয় একটা কালো জাম্বুবান। চোখ দুটো তার অদ্ভুত। এতটা গর্তের মধ্যে ঢোকানো যে চট করে দেখাই যায় না। নজর করলে দেখা যায় সেখানে শাদা অংশ নেই, শুধু দুটো কালো মণি। সে চোখে একটা উদগ্র ও হকচকানির ভাব সব সময় লেগেই আছে।

এই শিউবচনের টাকার প্রতি লোভ অপরিসীম, তবু ভকত বলে তার খ্যাতি আছে। নিজের ব্যবসাগত কাজ বাদ দিলে সারা দিন কাটে তার সাধুদের সঙ্গে। বাইরের লোকালয়ের সঙ্গে তার

কোন যোগাযোগ নেই। কখনো গাঁজা খেয়ে, ধর্মালোচনা করে কিংবা রামায়ণ মহাভারত পড়েই তার দিন কেটে যায়। শুধু ভক্তি নয়, সাধুদের প্রতি তার একটা দুর্বলতাও আছে। বিদেশে বাংলার এই নিরালা গঙ্গার ধারে থেকে সে যে টাকা রোজগার করে সেই টাকা দিয়ে মাঝে মাঝে সাধুদের অসম্ভব দাবী মেটাতে ও কোন সঙ্কোচ বোধ করে না। মনে মনে কোন সময় আপত্তি থাকলেও নিজেকে চেপে রাখতে পারে না সে। অথচ নিজের জন্য এক পয়সা খরচেও দারুণ কার্পণ্য তার। এবং সাধুদের অনেককে দেখা যায়, তাকে রীতিমত ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে। কিন্তু একটা অদৃশ্য শিকলে যেন সে বাঁধা রয়েছে এখানে। কোন কোনদিন সাধুদের সঙ্গে ঝগড়া হলে সে বুক চাপড়ায়, এমন কি চেঁচিয়ে একাকার করে। অথচ কোনদিন চলে যায় না। শুধু ভগবানকে অভিযোগ জানিয়ে সে শান্ত হয়ে যায়।...

কাল বৈশাখীর ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় জল নেমে এল। কিন্তু কিসের ভাবনায় যেন শিউবচন বিভোর হয়ে গিয়েছে। হাসি নেই, তার সারা মুখে একটা সোহাগের স্নিগ্ধতা দেখা দিল। তার একমাত্র মা-মরা ছেলের কথা মনে পড়েছে তার। দশ বছর সে তাকে দেখে নি। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার সময় ছেলেকে সে তার শালীর কাছে রেখে এসেছিল। তখন ছেলের বয়স দশ। তারপর আর কোনদিন দেখা হয় নি।

ভাবতে ভাবতে বেদনায় ও নিঃশব্দ কান্নায় তার মুখটা বোবা জানোয়ারের মতো বিকৃত হয়ে উঠল। তার মরা বউয়ের কথাও মনে পড়েছে। বউ মরার পর থেকেই সে সাধুদের পিছনে ঘুরত। কিন্তু ঠিক সাধু সে হতে পারে নি। পয়সা রোজগারের প্রতি একটা টান তার থেকে গিয়েছিল। অথচ সমাজ জীবনে ফিরে যেতেও পারে নি। জীবনের কোথায় তার একটা অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে রয়েছে যাতে সে ঘরেও যেতে পারে নি, ঘাটেও পুরোপুরি আসতে পারে নি।

আজকে এই মুহূর্তে ছেলের কথা মনে হতেই তার বুকটা টনটনিয়ে উঠল। এমন করে ছেলের বিরহ তার আর কোনদিন বাজে নি। হঠাৎ সে স্থির করে বসল, ছেলেকে সে এবার তার কাছে নিয়ে আসবে, ব্যবসার কাজকর্ম শেখাবে তাকে। শেষ পর্যন্ত ছেলে ছাড়া তার আছেই বা কে?

নৌকার ভিতরে যেতে যেতে সে হাঁক দিল, 'ফুলবর্ষিয়া! বর্ষিয়া রে!

ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে সাধুদের আস্তানার দিক থেকে একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'যাই।'

পরমুহূর্তেই একটা খিলখিল হাসি ঝড়ের শব্দের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল।

দেখা গেল একটি মেয়ে ছুটে আসছে নৌকার দিকে। হাওয়ার দাপটে উড়িয়ে নিচ্ছে তার কাপড়, সাজি মাটি মাখা এলোচুল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার চোখে মুখে, ধূলোয় চোখ বুজে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি মই বেয়ে সে নৌকার খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তার সারা গা খোলা। শুধু বুকে কাছে হাত দিয়ে আঁচল চেপে ধরেছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা মেয়েটির। মাজা মাজা রং। ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখে ও পাত্‌লা ঠোঁটের কোণে তার অদ্ভুত অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের হাসি চমকাচ্ছে। বয়স প্রায় উনিশ-কুড়ি। সে ঠিক সুন্দরী নয়, কিন্তু একটা অসহ্য সৌন্দর্যের ধার তার সর্বাঙ্গে। তার উপর সাজি মাটি মাখা এলোচুলে ও বাঁকা হাসিতে সৌন্দর্য তার বন্য হিংস্রতা পেয়েছে। সাপের মতো বেড় দেওয়া রয়েছে তার গলায় রূপার হাঁসুলী।

সাধুদের আস্তানায় কিংবা শিউবচনের মতো প্রায় বুড়ো ব্যবসায়ীর নৌকার খোলে সে একবারে মুর্তিমতি বেমানান। পথের মাঝে বিপথের ধাঁধার মত।

তেজী গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল সে, 'চিল্লিয়ে মরছে কেন? ক্যা হুয়া?'

শিউবচন তখন ছেলেকে আমন্ত্রণের আনন্দে মশগুল। এক মুহূর্ত সে হাঁ করে লুব্ধ চোখে ফুলবর্ষিয়াকে দেখে বলল, 'জলদি একটু কাগজ দে। চিঠি লিখব।'

'মরণ! তোমার আবার আছে কে যে চিঠি ভেজবে?'

অমনি রাগে কুঁচকে উঠল শিউবচনের মুখটা। কিন্তু কিছু বলল না। ভাবল হারামজাদী ওই জোয়ান খচ্চর সাধুগুলির কাছে আস্কারা পেয়ে বড্ড বেড়ে উঠেছে। ওকে কড়া হাতে সজুত না করলে হবে না।

কিন্তু ভাবা পর্যন্তই। একটু পরেই সে কথা ভুলে যাবে শিউবচন। না গেলেও মুখে অন্তত আনবে না।

ছোট একটা কুলঙ্গি থেকে এক টুকরো কাগজ শিউবচনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ফুলবর্ষিয়া এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপরে হঠাৎ চুল এলিয়ে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে গুণগুণ করে উঠল:

অব্ দিন্ বিদ্ যাতি, কিযেন্ কা ভেট না মিলল্ হো।

শিউবচন তার গর্তের ভিতরে ক্রুদ্ধ চোখ দুটো দিয়ে তাকে দেখে নিল। তারপর দোয়াতের ভেতর কলম ডুবিয়ে নিয়ে মাত্রাহীন দেবনাগরী ভাষায় লিখে চলল, 'মেরা পয়ারে বেটা রামবচন···

বাইরের হাওয়ার ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ছ ছইয়ের বেড়ায়। ডাঙ্গার বাঁশের ঠেকো দিয়ে রাখা নৌকাটা ঝড়ে দুলছে যেন জলে ঢেউ কেটে চলার মত।

ফুলবর্ষিয়া তখনো গুণগুণ করছে। ও হচ্ছে শিউবচনের আর এক কীর্তি। মেয়েটা মুলুক থেকে এসেছিল বছর তিনেক আগে তার স্বামীর সঙ্গে। ভিতরে শহরে একটা বস্তিতে সে থাকত। স্বামী কাজ করত চটকলে। দু'বছর পরে স্বামী মরে যেতে ওর ভাসুর তিন শো টাকায় বিক্রি করে দেয় শিউবচনের কাছে।

শিউবচন নিজে মনে করে ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেছে। একটা চিরাচরিত কৈফিয়ৎও দিয়েছিল সে; বিদেশে পড়ে আছি, বয়সও হয়েছে, দেখাশোনা করার একটা লোক না হলে আর চলে না।

অবশ্যই আওরৎলোকের কথাই বলছে সে। সেই দিন থেকে আর একটা নতুন রকমের লোভানি ফুটে উঠল তার চোখে। সকলের অগোচরে রাখা তার জমানো টাকার পুটলিটা যেমন করে সে হাতে নিয়ে দেখে, ফুলবর্ষিয়ার দিকে তাকালে তেমনি একটা লোলুপতায় চকচক করে ওঠে তার মণি দুটো।

ফুলবর্ষিয়া প্রত্যহ ভাসুরের মার ও নির্জলা উপোসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল বটে কিন্তু যেমন শান্তশিষ্ট ঘরওয়ালী বহুর মত ঘোমটা টেনে সে এসেছিল, দু'মাস না যেতে দেখা গেল সে নির্লজ্জ আর অবাধ্য হয়ে উঠেছে। মুখে যার রা ছিল না, সে হয়েছে রা ও বিদ্রূপভাষিণী। বিশেষ শিউবচনের প্রতি তার ঘৃণা বজ্জার সীমা নেই। গঙ্গার ধারের সাধুঘাটের দেবলোকের নির্জনতা তার হাসিতে চমকে উঠে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দিনে রাত্রে সে হাসি এক অশরীরি সত্তার মোহ ও ভয় ছড়িয়ে দিল জায়গাটাতে।

কিন্তু আশ্চর্য! এ ব্যাপারে সাধুরা কেউ আপত্তি করে নি। তাদের ভাবখানা যেন নতুন একটা খোরাক পেয়ে খুশী হয়েছে তারা। বিদ্রূপ ও দৌরাত্ম্যের মাত্রাটা বাড়ল শিউবচনের উপর। এমন কি ফুলবর্ষিয়ার তিক্ততাটা টের পেয়ে, সাধুরা সুযোগ পেলেই তাকে লেলিয়ে দেয় শিউবচনের বিরুদ্ধে আর পিছনে দেয় হাততালি।

তারপর দিনই শিউবচন গাড়ী ভাড়ার টাকা আর চিঠি পাঠিয়ে দিল ছেলের নামে। প্রায় দিন দশেক বাদে ছেলে এসে হাজির হল এখানে।

ভর দুপুরে রামবচন এসে যখন দাঁড়াল তখন তাকে বোঝা যায় যে, সে অপরিচিত এবং বিদেশী হৃষ্টপুষ্ট শক্ত কালো জোয়ান। শুধু রাত্রি জাগা নয়, তার সারা শরীরে ও চোখে

মুখে বিহারের রুক্ষতা। ইতিমধ্যেই মোটা কালো ঘন গোঁফ তাকে গম্ভীর করে তুলেছে। অপরিচিত পরিবেশে ও কৌতুহলে চোখের দৃষ্টি কিশোরের ঔৎসুক্যে ভরা। গলায় একটা লোহার মাতুলি। ছেঁড়া কামিজের ফাঁক দিয়ে বুকের মাংসপেশী দেখা যাচ্ছে। মাথায় গামছা বাঁধা। লাঠির ডগায় ছোট একটা পুঁটলি।

সাধুদের আস্তানার অদূরেই সে থমকে দাঁড়াল। রাস্তাটার তুপাশে ঝোপঝাড়। এদিকে ওদিকে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে ফুলের সমারোহ। বটের তলায় ঘুমোচ্ছে কয়েকজন সাধু। বাঁ দিকের মাঠের ওপর নৌকা। জোয়ারের ভরা গাঙ্গ বয়ে চলেছে উত্তরে। চারিদিক নিঝুম।

এমন সময় চমকে দিয়ে বুনো ঝোপের জঙ্গল নড়ে উঠল আর তার ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ফুলবর্ষিয়া। গায়ে জামা নেই, আচল তেমনি চেপে ধরা। রামবচনকে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। চকিতে তার চোখে আলো ফুটে উঠল। দেখেই সে বুঝে নিয়েছে, এ এক আনকোরা, মুল্‌কি আদমি। আর শিউবচনের ছাপও রয়েছে জোয়ান মানুষটার মুখে।

সে ঠোঁট টিপে হেসে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, 'কা হো মরদ, কোথা থেকে আসছ ?'

রামবচনের অজ পাড়াগেঁয়ে মন একটু ভড়কে গেল। কিন্তু ফুলবর্ষিয়ার চাউনি যেন তীরের ডগায় রং মাখিয়ে ছুঁড়ে মারল তার বুকে। তবু হাসতে সাহস পেল না সে। বারকয়েক গোঁফ হাতিয়ে সে বলল, 'মুল্‌ক্ থেকে আসছি।'

'মুল্‌ক্ কঁহা বটে ?'

'বিহার।'

'আচ্ছা।' সংশয় কাটল খানিক ফুলবর্ষিয়ার। তার বাঁকা চোখের তীব্র ক্ষুধার্ত দৃষ্টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রামবচনকে। তারপর কি মনে করে সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে শরীর

ঢাকল। পর মুহূর্তেই ফিক করে একটু হেসে বলল, ‘তা এধারে কোথা যাওয়ার মন করেছ ?’

সঙ্কোচের মধ্যেও একটু রংএর ছোঁয়া লেগেছে রামবচনের অপরিচিত চোখে। এবার বারকয়েক গোঁফে পাক দিয়ে, আর খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলল, ‘আমি শিউবচনের বেটা রামবচন। বাপ আমার কারবারী। এই গঙ্গা কিনারে···’

‘হাঁ ?’ কথার মাঝেই বলে উঠল ফুলবর্ষিয়া, ‘বহুত্ শরীফ আদমির লেড়কা দেখছি বটে তুমি ?’ বলেই সে নিঝুম দুপুরকে চমকে দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল। তারপরই চিলের মত চীৎকার করে উঠল, ‘আরে হোই হো বেপারী, এ শিউবচন বাবুজী···’

তার চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল সাধুদের। রামবচন বিস্মিত মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল এ বে-শরম আজব অওরতের দিকে।

শিউবচন চীৎকার শুনে দিবানিদ্রা ছেড়ে হাঁকপাঁক ক’রে উঠে পড়ল ছইয়ের উপর, ‘কি হয়েছে অ্যাঁ, ক্যা হুয়া ?’

‘আমাকে পাকড়ে নিয়ে যাচ্ছে এ পর্‌দেশী,’ সে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। রামবচনকে বলল, ‘চলে এস জোয়ান, তোমার বাপের গদীতে তোমাকে দিয়ে আসি।’ বলে সে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল। শিউবচনকে বলল, ‘লাও, দেখ কে এসেছে। পহ্‌চান সাকতা কি নাহি ?’

শিউবচন মই বেয়ে তাড়াতাড়ি ঘাটে নেমে পড়ল। রামবচন তার দিকেই আসছিল। সেদিকে একবার হাসি ও বিস্মিত সংশয়ে তাকিয়ে শিউবচন দু’হাত বাড়িয়ে দিল, ‘রামবচন, আমার ব্যাটা না তুই ?’ বলে সে রামবচনের একটা হাত চেপে ধরল। চোখের গর্তের ভেতর থেকে তার জল গড়িয়ে এল। কিন্তু একটা হতাশা মনের কোন ফাঁক দিয়ে এর মধ্যেই ঢুকে পড়েছে তার। এতবড় একটা গম্ভীর কঠিন পুরুষের কথা

সে চিন্তাই করতে পারেনি। তবু তাকে হাত ধরে সে তুলে নিয়ে এল নৌকায়। বসাল পাটাতনের উপর—'বোস্ বেটা বোস্।'

রামবচনের মুখে কোন কথা নেই। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছে। এতবড় নাও আর তার বাপ। থেকে থেকে তার চোখ জোড়া ছইয়ের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকা ফুলবর্ষিয়ার উপর গিয়ে পড়ছে। ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না, আওরৎটা কে। ওর চাপা হাসি, তেরছা চাউনি তার মোটা চামড়ায় বারবার বিঁধছে। কিন্তু লজ্জা ভয় সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে।

শিউবচন তাড়াতাড়ি নিজের হাতে তামাক সেজে বারকয়েক হুকোয় টান দিয়ে রামবচনের দিকে খানিকটা বাড়িয়ে দিল। রামবচন অবলীলাক্রমে হুঁকোটা নিল। মাথার থেকে গামছাটা খুলে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানতে লাগল।

শিউবচন তার মনটা খোলবার চেষ্টা করল। বলল, 'ওহো বেটা, কতদিন তোকে দেখিনি!'

ছেলে আরও মোটা গলায় জবাব দিল, 'দেখতে মন চায়নি তাই দেখনি।'

একটু যেন কুঁকড়ে গেল শিউবচন। বলল, 'নহি নহি বেটা, কতদিন ভেবেছি, একবার আমার রামুয়াকে দেখে আসি—কিন্তু বেটা একদম ফুরসত্ পাইনি। এ শালার কাজ বড় ঝামেলার।'

'খবরটাই কি একটু নিয়েছিলে?' একেবারে কাটা কাটা প্রশ্ন রামবচনের। ফলে কথা যোগায় না বাপের মুখে। বোঝা গেল আসলে বাপের প্রতি অভিমান হয়েছে তার। এতদিন বাদে কাছে পেয়ে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

আবার বলল রামবচন, 'আমি তো ভেবেছিলাম, মরে ধরে গেছ কোথাও।'

কথাটা শুনে যেন আঁৎকে উঠল শিউবচন। খালি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, হে ভগবান!'

তারপর চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। বলল, বেটা, তুই আমার উপর গোসা করেছিস্‌।'

রামবচন হুঁকোটা হেলান দিয়ে রেখে বলল, 'গোসা আবার কি, তোমার শরীরে একটু মায়া দয়া নেই। সেই মাসীর কাছে দিয়ে এলে, বাস একেবারে বে-পাত্তা। আর আমি শালা…'

বলতে বলতে ফুলবর্ষিয়ার দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল সে।

ফুলবর্ষিয়া তেমনি হাসছে। নীরব হাসির দমকায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর।

শিউবচন উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, 'কেন, মাসী তোকে পালেনি, দু'বেলা খেতেও দেয়নি ?

রামবচনের গলায় এবার আর একটু ছেলেমি রাগ ও দুঃখ ফুটে উঠল, 'মাসীর বয়ে গেছে। তুমি চলে গেলে মেসো নোকর বলে তুলে দিয়ে এল দীনদয়াল বাবুসাহেবের বাড়ী।'

'হাঁ ? আরে রাম রাম! হে ভগবান কত দুঃখ দিয়েছ এই বাচ্চাকে!'

কিন্তু তার বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল। রাগ হতে লাগল যখন সে দেখল রামবচনের বিস্মিত মুগ্ধ চোখ কিছুতেই ফুলবর্ষিয়ার দিক থেকে ফিরছে না। ইচ্ছে হল চোখ দুটো গেলে দেয়।

পরমুহূর্তেই তার রাগটা গিয়ে পড়ল ফুলবর্ষিয়ার উপর অমনি সে পেছন ফিরে খ্যাঁক করে উঠল—'এই হারামজাদী, কার রূপ দেখছিস্‌ এখানে বসে বসে? যা চুলা ধরা, রুটি বানা। ছোঁড়াটাকে খেতে দিতে হবে না?'

চকিতে একবার ফুলবর্ষিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তেই আবার তেমনি হেসে অবিশ্বাস্য রকম শান্ত মেয়ের মত ছইয়ের মধ্যে ঢুকে গেল সে।

রামবচন বিস্মিত অনুসন্ধিৎসু চোখে বাপের দিকে তাকাল।

শিউবচন ছেলের দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ দুটো নামিয়ে নিল। তারপর বলে উঠল, 'যাক বেটা, অনেক দুঃখ ধান্দা করেছিস। এবার আমার সঙ্গে একেবারে লেগে যা। এতেও দুঃখ আছে, তখলিফ পোয়াতে হবে অনেক। পয়সা কামাতে গেলে সে তো জরুর হবে। কিন্তু পয়সা যখন ট্যাঁকে আসবে তখন ফুর্তিতে দিল্ চুক্‌চুক্ করবে। হাঁ, এয়সা চিজ পয়সা। তবে হ্যাঁ, আপনা কলিজার থেকেও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নইলে ফুড়ুৎ...শালা আশবানের চিড়িয়া বনে যাবে।' বোকার মত অবাক হয়ে রামবচন তার বাপের গর্তে ঢোকা লুব্ধ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার অনেক দিনের আগের একটা ঝাপসা চেহারার কথা মনে পড়ে। দশ বছর আগের ক্ষীণ স্মৃতি। তার সেই বাবা। দিনরাত ভগবান ভগবান করত, লোকজনকে ভারী মিঠে বুলি বলত, পরের উপকারও করত। এখনো লোকে তাকে দেখিয়ে বলে: শিউবচন ভকতের দুঃখী লেড়কা এটা।

কিন্তু আজকের এ মানুষটা, তার এ বাপটা এবং তার খানিকটা শহুরে ঢংএর কথাবার্তায় যেন অচেনা মনে হতে লাগল। এমন কি চেহারাটাও কি রকম কুৎসিত মনে হতে লাগল তার। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকটি কথা সে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। বাঁচবার হালচাল তাকে বুঝে নিতে হবে বৈকি

শিউবচন তখনো বলে চলেছে, 'তবে হ্যাঁ, পয়সা ধরে রাখতে জানতে হয়। ধর্মের পথে থাকলেই পয়সা থাকবে। খবরদার অওরতের পেছনে কখনো টহল দিস্ নে, ফিরেও তাকাস্ নে। ও শালার জাতই খারাপ। শহরের সব কিছুই খারাপ। কিন্তু জেগে ঘুমোবে, কিছুই দেখবে না আর...'

কিন্তু শিউবচনের কি রকম অস্বস্তি হচ্ছে তার এতবড় গুঁফো গম্ভীর ছেলেকে উপদেশ দিতে। এইটুকুন সময়ের মধ্যেই ওর সরল

রুক্ষ চাউনিটাকে কি রকম ভয় লাগছে তার। বিশেষ ওর এই না হাসা, আর গোঁফ মোচড়ানোর বহরটা অসহ্য। নিজেও সে গোঁফ রাখবে কিনা, তাই মনে হতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আর... আমি তোর বাপ, তোর জনমদাতা। ঈশ্বরের নিয়ম বাপের হুকুমে ব্যাটা চলে। তাই বলছি ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেও না।' বলে রামবচনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে থেমে গেল। কথাটাতে যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সে প্রকাশ করে ফেলেছে। কিন্তু আসলে রামবচন খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি বোঝবার চেষ্টা করছিল।

তারপর শিউবচন তাকে তার ব্যবসার ব্যাপারটা একটু বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, 'যা গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে আয়, পেট ভরে খা। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি বাবা, আমার জমানো একটা আধলাও নেই। রোজগার হবে, তবে আমাদের আবার একটু সুখ হবে।

বোঝা গেল রামবচন ব্যবসার কথা কিছুই বোঝেনি। আর এই বিশ বছর পর্যন্ত বয়সে, পয়সা হাতে নেওয়া কাকে বলে সে জানে না। দীনদয়ালের বাড়ীতে নোকর থেকেছে, চাষী রাখালের কাজ করেছে, যখন যা পেয়েছে খেয়েছে আর বিচুলী ঘরে পড়ে থেকেছে। হিসেব টিসেবের বালাই তার নেই, জানেও না। সুতরাং, ওই জিনিষটার প্রতি কৌতুহল থাকলেও মোহ নেই।

ওসব দিকে ভাবার তার কিছু নেই। কিন্তু ওই লেড়কী মানে আওরৎটা কে আর বাপের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কি জিজ্ঞেস করতে তার বাধছে। অবশ্য এরকম সাংঘাতিক বে-শরম জেনানা সে খুব কমই দেখেছে কিন্তু তার এতদিনের নির্লিপ্ত বদ্ধ প্রাণের দরজাটায় যেন কুড়োল মেরে চিড়্ ধরিয়ে দিয়েছে।

স্নান করতে যাওয়ার আগেও তার সঙ্গে কয়েকবার চোখাচোখি হয়ে গেল ফুলবর্ষিয়ার। এর মধ্যেই জেগে ঘুমোবার পালা এসে

পড়ল তার। অর্থাৎ, ফুলবর্ষিয়ার মন রাঙ্গানো মুখটা কেবলি ভাসতে লাগল তার চোখে।

স্নান করতে করতে একটা শব্দে সে চমকে ফিরে দেখল খানিকটা দূরেই বাসন ধুচ্ছে সেই মেয়েটা। জোয়ারের স্রোতে বুঝি বাসনই ভেসে যায়, তবু ঘাড় কাৎ করে তেমনি হেসে হেসে দেখলে রামবচনকে। চোখে চোখ পড়তেই মিষ্টি হাসির ঝঙ্কার তুলে আঁচল উড়িয়ে সে পালাল। অমনি ধ্বকধ্বকিয়ে উঠল রামবচনের বুকের মধ্যে। তার অবশ শরীর জোয়ারের টানে ভাসিয়ে নিয়ে গেল খানিকটা। যেন হঠাৎ পাগলা বাতাসের ধাক্কা লেগেছে।

স্নান করে ফেরবার পথে সাধুদের গাছতলায় গিয়ে নমস্কার করল সে। আশীর্ব্বাদ করল সাধুরা। জিজ্ঞেস করল দু'চার কথা। তারপর একটা ল্যাংড়া সাধু মাথায় জটা আর দাড়ির ভেতর থেকে আধ বোঝা চোখে তাকিয়ে মাতালের মত হেসে বলল, 'তা লেড়কা দেখছি বেশ জোয়ান। তোর মায়ি তোকে বেশ যত্ন টত্ন করছে তো?'

মা? হাঁ করে তাকিয়ে রইল রামবচন। কয়েকজন সাধু হেসে উঠল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। আবার বলল সেই সাধুটা, 'ওই যে ছুকরি, শিউবচনের ঘর-ওয়ালী না কি বলে…'

বলে আবার তারা হেসে উঠল। এবং এরকম একটা খারাপ ব্যাপারে সাধু ব্যক্তিদের মত লোকেরও হেসে উঠবার কি থাকতে পারে ভেবে পেল না রামবচন। অপমানে কুঁকড়ে গেল তার গেঁয়ো মনটা। এখনো তার গায়ে বিহারের অজ গাঁয়ের গন্ধ লেগে রয়েছে তবু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার মনটা অনেকখানি তিক্ত হয়ে উঠল।

ফিরতে গিয়েও সে কয়েকটা কথা শুনতে পেল তার বাপ আর ফুলবর্ষিয়ার সম্পর্কে। হঠাৎ ফুলবর্ষিয়ার প্রতি মনটা শুধু বিমুখ নয়, ঘৃণায় ও রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ঘরওয়ালী নয়, একটা

রেণ্ডি বিশেষ ছুকরিটা। তাই অমন ছেনালের মত ঢলে ঢলে হাসছিল।

একে গেঁয়ো, তায় খানিকটা গোঁয়ার। নৌকায় যখন ফিরল, তখন সারা মুখটা থম্‌থম্ করছে। বাপের প্রতিও কেমন একটা ঘৃণা ধরে গেল। লোকটা বাইরে বাইরে এসবই করে বেড়িয়েছে তাহলে। তাই ছেলের উপরও দরদ ছিল না।

শিউবচন ভাবছিল, ছেলের কাছে কি একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করবে সে ফুলবর্ষিয়ার জন্য। কিন্তু মুখ দেখে তার সাহস হল না। আর ফুলবর্ষিয়ার কাণ্ডটা দেখে ভেতরে ভেতরে রাগের মাত্রা চড়ছিল। ভাবল, শালা এবেলা দুটো ছাতু খেতে চাইলে ছুঁড়ির দিতে ওবেলা হত। আর এখন কাজ করছে যেন মন্তর দেওয়া ডাইনী। এর মধ্যেই আটা মেখে উনুন ধরিয়ে দিব্যি রুটি সেঁকতে বসে গিয়েছে। যেন ওর কতকেলে ভাতার এসেছে!

আশ্চর্য! এরই মধ্যে কখন সে আঁট করে বেঁধেছে চুল। খোঁপায় দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া, কাপড় পরেছে বদলে। বুকের কাছাকাছি শাড়ীর পাড়ের উপর নেমে এসেছে হাঁসুলী। কিন্তু পিট ঘাড় আর হাত তার তেমনি খোলা।

দূরের খেয়াঘাটের কাছ থেকে অনেক গলার স্তিমিত স্বর ভেসে আসছে। গাছে গাছে ভিড় লেগেছে পাখীর। ঢলে পড়ছে বেলা। গঙ্গার ঢেউহীন জোয়ারের জল নিশঃব্দ। চলেছে এক টানা। বৈশাখের মেঘহীন দিগন্তহীন আকাশের গায়ে কৃষ্ণচূড়ার মাথাগুলি যেন রক্তাম্বরী কিশোরী।

ঝকঝকে মাজা থালায় গরম গরম রুটি, লঙ্কা আর পেয়াজ কুঁচো নিয়ে এল ফুলবর্ষিয়া। রামবচনকে দিতে গিয়ে চোখাচোখি। আরও কাছাকাছি। আবার সেই মর্মঘাতী কটাক্ষ!

হঠাৎ হেঁড়ে গলায় খেঁকিয়ে উঠল রামবচন, 'হট যা হিঁয়াসে। বেওকুব খারাব আওরৎ।'

উনুনের আগুন থেকে তামাক সাজছিল শিউবচন। সে চমকে একেবারে হা হা করে ছুটে এল।—'কি হয়েছে ?'

কিন্তু কেউ-ই কিছু বলল না। রামবচন ফিরিয়ে নিল তার ক্রুদ্ধ মুখটা। আর ফুলবর্ষিয়া শক্ত হয়ে বেঁকে দাঁড়াল যেন একটা ধারালো বাঁকা তলোয়ারের মত। চোখে তার ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে আগুন।···এক মুহূর্ত। তারপর সে তিক্ত হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল; 'গেঁয়ো ভূত, গোঁয়ার উল্লুক···।' বলেই শিউবচনকে একটা ধাক্কা দিয়ে, নৌকা কাঁপিয়ে দুপদাপ করে নেমে সাধুদের আস্তানার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিউবচন খালি বলল, 'হে ভগবান!'

কিন্তু রামবচন একটি কথাও বলল না। সে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু রাগের মাত্রাটা তাতে কমেনি। একবার সে তার বাপের দিকে তাকাল। কথা তো দূরের কথা রাগের মাত্রাটা আরও চড়ল তাতে।

হতভম্ব শিউবচন ভেবেছিল হয়তো কিছু বলবে ছেলেটা। তাহলে একটা কৈফিয়ৎ সে দিতে পারবে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। রামবচন বেমালুম থালাটা তুলে নিয়ে গঙ্গামুখো হয়ে খেতে আরম্ভ করল। শিউবচন মনে মনে বলল, শালা লেড়কা নয়, যেন আমার বাপ!' কিন্তু খুশী হয়েছে সে মনে মনে। বুঝে নিয়েছে, ফুলবর্ষিয়া হারামজাদী আর পেখম খুলতে পারবে না এখানে। বড় শক্ত ঠাঁই।

কোন্ ফাঁকে মেঘ করে এসেছে ঈশান কোণে। আচমকা হাওয়া উঠল। তোলপাড় হয়ে উঠল গঙ্গার জল। ভীত পাখীর কিচির মিচির।

সাধুদের আস্তানার দিক থেকে ভেসে এল ফুলবর্ষিয়ার তীক্ষ্ণ গলার হাসির ঝঙ্কার। রামবচন চমকে মাঝ গঙ্গার দিকে তাকাল। মনে হল সেখান থেকে হাসিটা শোনা গেল, পরমুহূর্তেই কানে এল বিদ্রূপপূর্ণ মেয়েলি গলায়, 'আরে, একটা গাড়োল আর একটা গেঁয়োভূত।' তারপরে আবার হাসি।

হাসি আর ধূলি ঝড়। ঝাপসা হয়ে গেল ওপারের হুগলি জেলা। কিম্ভূতাকৃতি হয়ে উঠল পর্তুগীজ গীর্জাটা। মাঝ গঙ্গায় উথালি পাথালি নৌকা।

দেখতে দেখতে খর জৈষ্ঠের অগ্নিদাহ নিভিয়ে নেমে এল জল। আষাঢ় পড়তে পড়তেই ঋতুমতী গঙ্গার লাল জল ফেঁপে ফুলে উঠল। জল উঠে এল মাঠে। ভাসল শিউবচনের নৌকা। পেল্লায় নৌকা। ভেতরের খোলটা যেন একটা গুদাম ঘর। মাঝির দল আর নৌকা-ভাড়াটে ব্যবসায়ী। শিউবচনের ঘরকন্না উঠে গেল সাধুদের আস্তানার পেছনের চালায়।

কাজের শুরু। শিউবচন একটা একটা করে কাজ বুঝিয়ে দেয় রামবচনকে। কিন্তু ছেলে যে এদিক থেকে একেবারে বিষহীন, তা সে জানত না। রামবচনের ধারণা বারো আনায় এক টাকা হয়। বোঝ! শুরু হয় পাখী পড়ানো—চার পয়সায় এক আনা, ষোল আনায় এক টাকা, পাঁচ গণ্ডায় এক কুড়ি।

'আর পাঁচ কুড়িতে কত ?'

রামবচন বলে, একশো।'

শিউবচন বলে, 'বা বেটা বেশ। আর ষোল আনায় ?'

'এক টাকা।'

'বাহবা বাহবা। ওই ষোল আনাটি ঠিক বুঝে নিতে হবে, বুঝেছ বাবা ? নইলে সব গণ্ডগোল।' বলে আবার জিজ্ঞেস করে, 'এক এক খেপ মারতে লাও যদি মাঝ পথে থেমে কোথাও মাল তোলে তবে ?'

রামবচন না হেসেই গম্ভীরভাবে বলে, 'বুঝতে হবে ফাঁকি দিয়ে দোবারা মাল তুলছে।'

'তাতে কি হল ?'

'তোমাকে ফাঁকি মারা হল।'

'আমাকে কি রে ব্যাটা, তোকে নয় ?'

রামবচন আরও গম্ভীর হয়ে বলে, 'ওই হল।'

'বাহ্‌বা ব্যাটা। ইংলিশে না কি বলে কথাটা? হ্যাঁ, ফাস্টকিলাশ।' বলে শিউবচন হাসে।

নৌকা সে মাসকাবারী ভাড়া খাটায় না। সেরকম খাটায়, নৌকা যাদের বাড়তি কারবার। সে খাটায় এক এক খেপ, যাকে বলে সে 'টিরিপ' মারা; তারপর সাধুদের পেসাদী কলকের গাঁজায় দম দিয়ে জুলজুলে চোখে খোঁজে ফুলবর্ষিয়াকে। কিন্তু কখনো একটি পয়সা সে রামবচনের হাতে দেয় না। রামবচনের তাতে কিছু যায় আসে না। বরং হিসেব শেখার কৌতুহলটা তার মন্দ লাগে না।

কিন্তু হার মানে নি ফুলবর্ষিয়া। সেদিন মনে হয়েছিল, বুঝি সে রাগ করেছে। করুক। তবু কামাই নেই তার নিরন্তর হাসির। তবু রামবচন যেদিন থেকে শুনেছে তার বাপের কেনা অন্তত সেদিন থেকে যেটুকু বা রং তার মনে লেগেছিল, সেটুকু চাপা দিয়ে রেখেছে।

এখন আকাশে সারাদিন মেঘ। মেঘ আর নিরন্তর বর্ষণ। গোমড়ামুখো দিন। কখনো মুষলধারে কখনো ইলশেগুঁড়ি, নয়ত ছিচকাঁদুনের কান্নার মত। যেন কান পচে যায়।

সকলেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে, ঝিমোয়। বেজায় দমে যায় রামবচন। তার খোলা প্রাণটা আটকা পড়ে গেছে। সত্য, সে দীনদয়ালের বাড়ীতে নোকর ছিল, কিন্তু কেমন করে তার দিন কেটে যেত, টের পেত না। মোষ চরানো, খাওয়ানো, ঘরে বাইরে কাজ আর ইয়ার দোস্তের সঙ্গে এটা সেটা আবোল তাবোল বকা, এই করে কেটে যেত। আর এখানে? কথায় বলে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। সুখ সে পেয়েছে কি না, কিন্তু স্বস্তি

নেই এতটুকু। পাওয়ার হিসাব পরে, চায় কি সে? ভাবে, কোদাল কোপালেও হত। বসে থাকা যেন মরে থাকা।

তার উপরে সারাদিন মেঘে মেঘে কালো দিন। আর ফুলবর্ষিয়ার হঠাৎ হাসির ঝঙ্কার। সে হাসিতে মেঘ নড়ে, শিউরে ওঠে বনপালা, ভরা গঙ্গার লাল জলে ঢেউ ওঠে, সোহাগী আকাশ ঝর ঝর করে জল ঢালে।

কেন, কিসের হাসি? রামবচন মনে মনে বলে, হাসি নয়, হাসির ব্যামো। যেন একটা সর্বনাশের নেশা জড়ানো। অবাক! রামবচনের দিকে অষ্টপ্রহর তার সেই নিষ্পলক বাঁকা চোখের নজর। কখনো ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে হঠাৎ ভেসে ওঠে তার চোখ, কখনো আচমকা ঝোপ ঝাড়ের ভেতর থেকে কিংবা গঙ্গার ঢালু জমির আড়াল থেকে ঝলকে ওঠে তার হাসি মুখ। ওই চোখ জোড়া যেন ছায়ার মতো দিবারাত্র রামবচনের পিছে পিছে ফিরছে।

কখনো হঠাৎ গায়ের কাছে এসে পড়া নয়ত আঁচলের ঝাপটা মারা, তারপর দুর্জয় শয়তানিতে ভরা চোখে চকিত কটাক্ষ ও শ্লেষ ভরে হেসে ওঠা।

কিন্তু রামবচন আর গায়ে মাখে না। মাখতে গেলেও চলে না।

ফুলবর্ষিয়ার এসব ব্যাপার চোখে পড়লেই শিউবচন খ্যাপা মোষের মত ছুটে এসে চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দেয়, ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয় ঘরের মধ্যে নয়ত কষে থাপ্পড় হাঁকে।

অমনি ফুলবর্ষিয়াও ঘুরে দাঁড়িয়ে কালনাগিণীর মত ফণা তোলে। তীব্র গালাগাল ও চীৎকারে লকলকিয়ে ওঠে তার জিভ, এমন কি হাত তুলতে যায় শিউবচনের উপর। রামবচন নির্লিপ্ত ঘৃণায় চুপ করে থাকে।

কী বিচিত্র মনোবৃত্তি। অমনি সাধুরা ওদের পরস্পরকে উস্‌কে দিতে থাকে। হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু শিউবচন যেন কেঁদে ফেলবে এমনি ভাবে চুপ হয়ে যায়।

তারপরে সে হঠাৎ ছেলের দিকে ফিরে বলে 'এসব কি হচ্ছে আঁ? তুই ছেলে হয়ে—'

রামবচনের চোখে রক্ত উঠে আসে। একেবারে মুঠি পাকিয়ে বলে, 'এই, দেখ বাপ বলে খাতির নেই। মিছে বলবে তো—'

শিউবচন দু'পা পেছিয়ে বলে, 'মারবি, অ্যাঁ?' তারপর কেঁদে ওঠার মত চীৎকার করে ওঠে, 'আমার ছেলে কি না তুই বল শালা। ওরে কুত্তা, ওরে শুয়োরের বাচ্চা, ওরে ঢ্যামনা, বাপের অওরতের সঙ্গে—'

'ফের ঝুটা বলছ!'

তীব্র গলায় রামবচন খেঁকিয়ে উঠতেই চুপ হয়ে যায় আবার সে। ঝুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ফুলবর্ষিয়ার রকম দেখেই তার সন্দেহ জন্মেছে।

এসব ছাড়াও রাত্রি আসে প্রত্যহ একই জঘন্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে, অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে। রামবচন চালার বাইরের সামান্য জায়গায় খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে রোজই শোনে।

প্রথম থেকেই ফুলবর্ষিয়া চাপা গলায় ফুঁসতে থাকে, 'আমি খেতে চাইনে, পরতে চাইনে। তোর সুখের কবুতর বনবার মুখে ঝাড়ু।'

শিউবচন তোত্‌লার মত মিঠে মিঠে বুলি বলে। তারপর রেগে বলে, 'ও, বাইরের ছোঁড়ার খাটিয়ায় যাবার মন করছে বুঝি?'

পরিষ্কার গলায় উচ্চারিত হয় 'করেই তো।'

'আমি ঘুমোলে বোধ হয় রোজই—'

ফুলবর্ষিয়ার গলায় ঢেউ দিয়ে ওঠে, 'তাই তো।'

হঠাৎ ফুঁসে ওঠে শিউবচন, 'আজকে দুটোকেই শালা কেটে গঙ্গার কোলে দিয়ে আসব।'

শ্লেষে বিঁধিয়ে ওঠে ফুলবর্ষিয়ার গলা, 'আরে আমার মরদ রে।'

পরমুহূর্তেই শিউবচন ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ওঠে, 'হে ভগবান, হে রামচন্দ্র—'

ফুলবর্ষিয়া বলে, যেন খানিকটা আকুল হয়েই, 'তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, রেহাই দাও। আমি তোমার তিনশো রূপায়া শোধ দিয়ে দেব। যেমন করে হোঁক।'

বাইরের খাটিয়ায় রামবচনের প্রাণের মধ্যে ওই কথাগুলোই অন্যরকমে উথালি পাতালি করে ওঠে, আমি চলে যাব, ভেগে যাব এই নরক থেকে।' সে উঠে চলে যায় গঙ্গার ধারে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। অন্ধকার। কি এক অদৃশ্য আলোতে যেন গঙ্গার ঢেউ চকচকিয়ে ওঠে। বোঝা যায় ভাটার টান চলছে। এদিকে ওদিকে জোনাকি জ্বলে। নৈঃশব্দের মধ্যে গঙ্গার একটানা কুলকুল ধ্বনি।

কোথায় যাবে রামবচন? এ দেশ চেনে না, খেটে খাওয়ার জায়গা চেনে না, হাতে একটা আধলা কড়িও নেই। কোথায় পালাবে? পালিয়ে পেট চালাবে কি করে? আর এই ফুলবর্ষিয়া অসহ্য করে তুলেছে তার জীবনটাকে। যা হবার নয়, তাই দিয়ে ও একটা মরদের বুকে জ্বালা ধরায় কেবলই! কেন?

কোন কোন দিন ফুলবর্ষিয়া রাত্রে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। শিউবচনও তার পিছনে ছোটে কুকুরের মত। এমনই পাগলের মত ছোটে যে, ছেলের কথাটা তার মনেও থাকে না। থাকলেও লজ্জা করে না।

যেমন ঘৃণা তেমনই কৌতুহলও হয় তার। জীবনে এরকম ব্যাপার সে আর কোন দিন দেখে নি। আর অসহ্য লাগে তার বাপের অবিশ্বাস।

কয়েকদিন আগে কি কারণে সে চালা ঘরটায় ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখেছিল, তার বাবা কোলের কাছে কি নিয়ে দেখতে দেখতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। হাসিতে হা হয়ে গিয়েছে মুখটা। গর্তে ঢোকা চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে রামবচন দেখল টাকার থলি একটা।

কিন্তু শিউবচন ছেলেকে দেখেই ত্রাসে অস্ফুট আর্তনাদ করে থলিটা কোলের মধ্যে হাত. চাপা দিয়ে রাখল। যেন এখুনি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

ছেলে ভাবে, তবে এ লোকটা তখন তাকে পেয়ারে বেটা বলে ডেকে নিয়ে এসেছিল কেন? জীবনে তো সবই হারিয়েছিল। কেন আবার দেখাল সে তার বাপকে আর কেন বা তার মত একটা গেঁয়ো নোকরের প্রাণে বারবার রং ছুড়ে মারছে ফুলবর্ষিয়ার মত অওরৎ।

আর এই সাধুগুলি শুধু তার বাপ আর ফুলবর্ষিয়াকেই উসকায় না তাকেও আবার উস্‌কে দিতে চায় ওদের দুজনের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া প্রায়ই চুরি করে ঘরের থেকে এটা সেটা নিয়ে যায়। ঘটি কাপড় এমন কি কোন সময় ছাতুর ঠোঙ্গাও। বাপ তার ভগবানকে দোষে আর সে কিছু বলতে গেলে হাত ধরে রাখে।

তখন সাধুরা রামবচনকেই বিদ্রূপ করে হেসে ওঠে।

লোকে বলে এটা সাধুঘাট। রামবচনের মনে হয় নরকের কারখানা। তাই এখান থেকে মনটা তার কেবলি পালাই পালাই করে।

কিন্তু পালাবার পথ নেই। কেবল তখনই রামবচন একটু মুক্তি পায়, যখন নৌকায় করে ভিন্ জায়গায় চলে যায় সে। দূরের খেপ্ হলেই তাকে নৌকায় যেতে হয়। কখনো দু'দিন, তিনদিন, এক সপ্তাহও বাইরে নদীর বুকে ও খালে বিলে দিন কেটে যায় তার। মাঝিদের সঙ্গে গল্প করে, তামাক খেয়ে, কখনো হাল ধরে বা বৈঠা টেনে তার দিন কাটে। ভাবে, মালিকের ছেলের চেয়ে মাঝি হওয়া ভাল ছিল।

তবু জলের বুকে দিনের পর দিন ঘুরতে বারবার তার মনে হয়, কি যেন সে ফেলে এসেছে পিছনে। তার হুঁকোর ধোয়া ডিঙ্গিয়ে দূর আকাশের বুকে কিম্ভুতাকৃতি মেঘ ফুড়ে হঠাৎ হেসে ওঠে একটা মুখ। আচমকা তার কানে রিন্‌রিন্ করে ওঠে একটা

খিলখিল হাসির ধ্বনি। আর কেবল মনে পড়ে যায় ফেলে আসা গাঁয়ের কথা, বিচুলি ঘরটার সোদা গন্ধ।

আবার ফিরে এসে নৌকা থেকে নামতে না নামতেই সে শুনতে পায় ফুলবর্ষিয়ার হাসি। কেবল ওর মুখটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল রামবচনের। কে যেন গোঙ্গাচ্ছে। মাথা ঘুরিয়ে দেখল চালা ঘরটার বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে। দরজা বন্ধ। কৌতুহল হলেও কোনদিন সে উঁকি দেয় না। আজকে হঠাৎ সে উঁকি দিল।

উঁকি দিয়েই ধড়াস করে উঠল তার বুকের মধ্যে। দেখল, ফুলবর্ষিয়া খালি গায়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে আর শিউবচন যেন একটা আদিম জানোয়ারের মত ওর উপর ঝুঁকে পড়েছে। হাত বুলোচ্ছে ওর গায়ে আর সেদিন টাকার থলিটা নিয়ে বসার মত কালো মুখটার ভাঁজে ভাঁজে হা করা মুখটা হাসিতে বিস্ফারিত। বেরিয়ে পড়েছে চোখ দুটো। গালা দিয়ে বোধ করি চাপা গোঙ্গানির মত একটা উল্লাসের শব্দ বেরুচ্ছে।

কেমন যন্ত্রনা করে উঠল রামবচনের বুকের মধ্যে। শক্ত হয়ে উঠল হাতের মুঠি। ইচ্ছে করল, দরজাটা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে গলা টিপে এখুনি ওই শব্দটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তা না করে সে ছুটে গেল জলের কাছে। যেন উড়ে যাওয়ার জন্য তাকায় ওপরের দিকে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও পরিষ্কার ভেসে ওঠে ওপারের পর্তুগীজ গীর্জার মাথার ক্রুশটা। ফিসফিসে বৃষ্টি। ছপ্ ছপ্ শব্দ জলের। হঠাৎ দু' একটা টিমটিমে আলো ভেসে উঠছে গঙ্গার বুকে। বর্ষার মরশুমে সারারাত্রি ঘোরে জেলেরা।

একটু পরেই ফুলবর্ষিয়ার গলার তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসে, "ফের?

হট্ যা পিশাচ, কমিনা। টুক্ করে বাতিটা যায় নিভে আর অন্ধকার যেন টিপে টিপে হাসতে থাকে শিউবচনের কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দে।

তবুও ভোরবেলা দরজা খুলেই ফুলবর্ষিয়া রামবচনের দিকে তাকিয়ে টিপে টিপে হাসে। লজ্জা হয়, তবু রামবচন অবাক হয়ে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

চোখের কোল বসে গেছে ফুলবর্ষিয়ার। ক্লান্ত মুখটা শুকনো। চোখের চাউনিটা আজকাল তার আরও ধারালো হয়েছে। যেন কিসের জ্বালায় জ্বলে। বাঁকা হাসিটা থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে ওঠে। কেঁপে কেঁপে ওঠে রামবচনের বুকের মধ্যে। মনে পড়ে এর মধ্যে কতদিন ফুলবর্ষিয়া কতদিন গভীর রাত্রে নিঃশব্দে উঠে এসেছে তার খাটিয়ার কাছে। রামবচনের গায়ে তার নিঃশ্বাস লেগেছে। হয়তো সন্ত্রস্ত আলতো স্পর্শে শিউরে উঠেছে বুকের মধ্যে। তার অজ পাড়াগেঁয়ে প্রাণে কোন পালিশের মুখোশ ছিল না। আগুন জ্বলেছে বুকে। তবু ও মরার মত পড়ে থেকেছে। বাপের মুখটা মনে করে থিতিয়ে গিয়েছে তার উত্তেজনা।

কিন্তু আশ্চর্য! ফুলবর্ষিয়া কোনদিন তাকে জাগিয়ে দেয়নি। সে দেখেছে, তারপরে ফুলবর্ষিয়া চলে গিয়েছে গঙ্গার কিনারে, যেখানটায় সে গিয়ে দাঁড়ায় রাত্রে। হাওয়ায় তার চুল আর শাড়ি ওড়ে। কি করে সে ওখানে দাঁড়িয়ে?

আজ সকলের দিকে খানিক্ষণ আকাশটা থমকে থেকে হঠাৎ প্রবল বর্ষণ শুরু করল। তার সঙ্গে সামুদ্রিক হাওয়ার প্রচণ্ড ঝড়। দিন রাত্রি একাকার হয়ে উঠল অন্ধকারে। দ্রুত বৈঠার চাড়ে জেলেরা সব ঘাঁটিতে নৌকা বাঁধতে লাগল।

বর্ষার গঙ্গার রূপ গেল বদলে। উত্তাল ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে উঠল। ক্ষেপে উঠল গৈরিক বসনা রুদ্র সন্ন্যাসিনী। একটানা গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠল চালা ঘর। দুমড়ে গেল শত শত বছরের পুরোন বট গাছটা।

শিউবচন ভীত কণ্ঠে তাকিয়ে বলল, 'হায় রাম! এ যে সাইকোলেন।'

সাইকোলেন! একটা নতুন কথা শুনে রামবচনও পৃথিবীর রুদ্রমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল।

আজ আর নৌকা ভাড়া দিল না শিউবচন। মাঝিরা শুয়েছিল নৌকার মধ্যে। তাদের হেঁকে ডেকে গাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধবার হুকুম দিল সে। তবে তার লোকসান গেল না। শহরের এক কারবারি এসে তার পিপেগুলি ভাড়া নিয়ে গেল। গাঁজার কলকে নিয়ে গিয়ে সে বসল সাধুদের আড্ডায়।

রামবচন বেরিয়ে পড়ল ঝড়ের মধ্যে। মাঝিদের সঙ্গে সেও লেগে গেল নৌকা বাঁধতে। সত্যি, ঝড়ের টানে পাঁচমণী নোঙ্গর সরে গিয়েছে। অতবড় চৌদ্দমাল্লাই নৌকাটাকে যেন কোন জলদৈত্য হিচঁড়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। দুটো মোটা কাছি দিয়ে তাকে গাছের সঙ্গে সবাই বাঁধল।

মাঝিদের সঙ্গে কাজ করে রামবচন হঠাৎ খুসী হয়ে উঠল। যেন দীনদয়ালের চারটে খ্যাপা মোষের পেছনে সে এতক্ষণ ছুটেছে।

খালি গায়ে জল নিয়ে সে ঘরে ঢুকতেই অন্ধকার কোণ থেকে একেবারে তার গায়ের উপর এসে পড়ল ফুলবর্ষিয়া। একটা শুকনো গামছা বাড়িয়ে দিয়ে তেমনি গা ঘেষে দাড়িয়ে ফিক্ করে হেসে উঠল।

রামবচন চমকে উঠে একবার তাকে দেখেই বেরুবার জন্য পেছন ফিরল। কিন্তু ফুলবর্ষিয়া চকিতে তার হাত ধরে মুখে হাসির বিষ নিয়ে বলল, 'কি, ভয় করে না ঘেন্না করে? মানুষ বলে সমঝাও না নাকি?'

রামবচন হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফুলবর্ষিয়া আবার বলল, 'তোমার ওই পিশাচ বাপের তিন শো টাকার কেনা বাঁদী, তাই বুঝি......'

কথা আটকে আসছে। তবু ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসিটুকু জিয়নো থাকে। রামবচন মুখ তুলে বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি আমার বাপের অওরৎ।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই শিউবচন একবারে তাদের দুজনের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠল। প্রথমেই ফুলবর্ষিয়াকে দু' হাতে জাপটে ধরে সে সরিয়ে নিয়ে গেল, 'হারামজাদী, রেণ্ডি কাঁহিকা, আজ দেখাচ্ছি তোকে।'

তারপরেই রামবচনের দিকে খেঁকিয়ে উঠল, 'কিরে শুয়োরের বাচ্ছা, বড় যে গোঁফ পাকিয়ে পাকিয়ে ভালগিরি ফলাস্। মনে করেছিস্ আমি শালা কিছু জানি না?'

রামবচন গম্ভীর হয়ে বলল, 'বাজে বকো না।'

'বাজে বকো না?' আরও ক্ষেপে ওঠে সে। চীৎকার করে বলে, 'আরে বেহায়া, বেজন্মা, তোর লজ্জা করে না?'

রামবচন হঠাৎ মাথা তুলে হিসিয়ে উঠল, 'খবরদার। চুপ হয়ে যাও।'

'তোর ভয়ে? তুই অওরৎ নিয়ে ফুর্তি করবি আর আমি……'

কথা শেষ করার আগেই রামবচন তাকে এক ধাক্কায় ঘরের বেড়ার ধারে মাটিতে ফেলে দিল, 'বাবাগিরি ফলাতে এসেছিস্ বুড়ো খচ্চর কোথাকার। টাকা দে, আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। থুক দিই তোর সুখের ভাতে। নীচ কাঁহিকা!'

শিউবচন ততক্ষণ চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে, 'হে ভগবান, আমার খেয়ে আমাকে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে হায় রাম, এ বেহায়ার মাথায় তুমি বাজ ফেলো। ওকে মার ডালো মার ডালো।'

ফুলবর্ষিয়ার ঠোঁটের কোণে হাসিটা আরও দুর্জয় হয়ে উঠলো। আড় চোখে বারেক বাপ বেটাকে দেখে নাকের পাটা ফুলিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটা চকিত বিরতির পর সামুদ্রিক ঝড়ের গোঙ্গানি দ্বিগুণ তীব্র হয়ে চালা কাঁপিয়ে ছুটে গেল। সেই সঙ্গে ভেসে এল সাধুদের

গাঁজার নেশা ধরা অট্টহাসি। যেন কোথায় একদল দানব মেতে উঠেছে এই দুর্যোগের সুযোগে।

রামবচন শান্তভাবেই গা হাত পা মুছে কাপড় ছাড়ল। শিউবচন তখনো ফোঁস ফোঁস করছে। তারপর হঠাৎ উঠে বসে ভাঙ্গা গলায় বলতে আরম্ভ করল, 'তুই আমাকে মারলি। আমি চিরকাল সাধুদের পিছে ঘুরেছি, ধর্মের সাধনা করেছি। একটা অওরৎ দেখে তুই আমাকে খারাপ ভেবেছিস্। কিন্তু আমার কি আছে? কুছ নাহি কুছ নহি, ভগবান কা চরণো মে সব দে দিয়া।'

বলে সে আচমকা রামবচনের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। চকিতে একবার সেদিকে দেখেই রামবচন ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হয়ে চোখে হাত চাপা দিল। সে দেখল, লোকটার পৌরুষ একটা অর্ধস্ফুট ইঙ্গিত মাত্র, সেখানে আর কিছু নেই। তার ইচ্ছে হল এখুনি কিম্ভুতকিমাকার জন্তুটার গলা টিপে সে নিকেশ করে দেবে। মনে হল তার সামনে কোন মানুষ নেই, একটা অপদেবতা রয়েছে।

বাইরে ঝড়ের গোঙ্গানি আর ঝাপটার শিষ্।

শিউবচন কাপড় পরে একঘেয়ে গলায় বলে যেতে লাগল, 'তোর মায়ের মরার পর আমি শুধু এরই সাধনা করেছি। আমার গুরু আমাকে শিখিয়েছে আর আমি বছরের পর বছরে পুরুষত্বের এই চিহ্ন গায়েব করে সিদ্ধিলাভ করেছি। কাঁহে? না ফিন্ আমার ঘরে মন টানতে পারে, আবার আমি সংসারে ফিরতে পারি।'

কিন্তু রামবচন ভাবছে, তবে লোকটা অওরৎ কিনেছে কেন? সংসার চায় না তো লোকটা এমন অর্থগৃধ্নু কেন? ছেলেকে পর্যন্ত সে একটা পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করতে চায় না।

রামবচনের মনে হল তার জ্বর হয়েছে, মাথাটা ভারী হয়ে গিয়েছে। হয়তো বমি হবে এখুনি। সে তাড়াতাড়ি বারান্দার খাটিয়াটাতে মুখ গুজে শুয়ে পড়ল।

শিউবচনের গর্তে ঢোকা চোখ দুটোতে একটা অর্থপূর্ণ খুশী ফুটে উঠল। সে বলতে লাগল, 'বুঝে দেখ্ আমি এখন পাপের ঊর্ধ্বে। ফুলবর্ষিয়া আমার কাছে খালি পুত্‌লা, শুধু গুঁড়িয়া কী খেলা……।

বলতে বলতে তার চোখে লোলুপতা ফুটে উঠল। সেই পুতুল খেলার স্বপ্নেই বোধ করি সে বিহ্বল বোবা জানোয়ারের মত হাঁ করে নিঃশব্দে হেসে উঠল। বলল, 'সেই পুতুলকে আমি তিন শো টাকায় কিনেছি। সাধুরা সব জানে, কিন্তু কিছু বলে না। অন্য কেউ যদি ওকে ছিনিয়ে নেয়, সেই পাপীকে ভগবান রেহাই দেবে না, কভি নহি। ভগবান উসকো মারেগা।'

বলে সে আরও কয়েকবার রামবচনকে দেখে গাঁজার তৃষ্ণায় বেরিয়ে গেল। শত্রুকে ঘায়েল করার জয়ের চাপা হাসি তার মুখে।

ঝড়। সমস্ত পৃথিবী যেন একটা সর্বনাশা খ্যাপামিতে মেতে উঠেছে, অন্ধকার হয়ে গেছে। সকাল না দুপুর না সন্ধ্যাকাল কিছু বোঝার উপায় নেই।

রান্না হয় নি। সাধুদের পূজার প্রসাদ নিয়ে এল ফুলবর্ষিয়া রামবচনের জন্য। রামবচন চোখ তুলে তাকাল ফুলবর্ষিয়ার দিকে অদ্ভুত নিষ্পলক চোখে। দৃষ্টি তার বিচিত্র, বেদনাচ্ছন্ন ও বিস্মিত। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম সে ফুলবর্ষিয়ার দিকে এমন করে তাকাল।

বাঁকা হেসে তাকাতে গিয়ে থম্‌কে গেল ফুলবর্ষিয়া। হঠাৎ কেঁপে গেল ঠোঁট। এই প্রথম রামবচনের নিষ্পলক অনুসন্ধিৎসু চাউনি দেখে তার মত মেয়ের দুর্জয় চোখের দৃষ্টি নেমে গেল। আচমকা ওই চোখ ফেটে বেরিয়ে এল জল। কেবল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দেখো না, এ পাপের দিকে চেয়ে দেখো না।'

তারপরে ছুটে ঘরের কোণে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে উঠল। টন টন করে উঠল রামবচনের বুকটা।

গভীর রাত। সারাদিনের পর রাতকে হাতে পেয়ে ঝড় যেন আরও ক্ষেপে উঠেছে। গোঁ গোঁ শব্দটা শোনাচ্ছে তীব্র হুঙ্কারের

মত। ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ গঙ্গার অন্ধকার বুকে। উত্তর ধারে শিউবচনের নৌকাটা একটা বৃহৎ জলচর জীবের মত দুলছে।

ঘুম নেই রামবচনের। একটা চটের আড়াল দিয়ে বাইরের খাটিয়ায় শুয়েছে সে।

হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ হল। তারপর বেরিয়ে এল ফুলবর্ষিয়া। আল্‌তো করে গায়ে হাত দিল রামবচনের। শিউরে উঠল রামবচন, তবু নিঃসাড়ে পড়ে রইল। নিঃশ্বাস লাগছে ফুলবর্ষিয়ার। তার এলো চুল এসে ঠেকেছে গায়ে। কয়েক মুহূর্ত। ফুলবর্ষিয়া চটের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে গেল। তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি। তার মধ্যেই সে গঙ্গার ধারে ঠিক সেইখানটাতে গিয়ে দাঁড়াল পশ্চিম মুখো হয়ে। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

রামবচন উঠে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে, তেমনি পশ্চিম মুখো হয়ে। একটু পরে ফিরে ডাকল, 'ফুলবর্ষিয়া!'

ফুলবর্ষিয়া টের পায় নি! চমকে ফিরে একেবারে দু'হাতে সাপটে ধরল রামবচনের চওড়া শরীরটা। কান্না তার দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

রামবচন বলল, 'ফুলবর্ষিয়া, আমি চলে যাব।'

'কোথায়?'

'মুলুক।'

'রূপায়া কোথা মিলবে?'

একটু চুপ করে থেকে রামবচন বলে, 'পয়দল যাব। যদি মরে যাই, তবু।

ঝড়ের ঝাপ্‌টাতে বৃষ্টির চাবুক পড়ছে তাদের গায়ে। যেন উড়িয়ে নিতে চাইছে। ফুলবর্ষিয়া বলল, 'দেশে নয়, আমার সঙ্গে তুমি চল। চল আমরা চলে যাই।'

'কোথায়?'

'দূরের শহরে।'

'আমি কিছু চিনি না।'

'আমরা চিনে নেব।'

'কি করব ?'

'কারখানায় নোকরি ধরব আমরা ছু'জনে। আমরা ঘর করব।'

'কবে যাব ?'

'আজ এখুনি চল যাই।'

অন্ধকারের মধ্যে একবার রামবচন ফুলবর্ষিয়ার মুখটা দেখবার চেষ্টা করল। ছুটো ব্যাকুল চোখে আলো আঁধারের খেলা। তারপর ফিরে তাকাল অন্ধকারের চালাটার দিকে। ঘৃণায় জ্বলে উঠল তার চোখ ছুটো। বলল, 'চল।'

চল! চল! প্রকৃতির চেয়ে উদ্দাম ঝড় হয়ে উঠল ফুলবর্ষিয়া নিজে। ঝড়ের তীব্র হুঙ্কার যেন তাদেরই হৃদয়ের উল্লাস। হাওয়ার চেয়েও আগে আগে তারা এগিয়ে চলল। অন্ধকারে ছুটো মূর্তি একটা হয়ে গেল। পিছনে পড়ে রইল শুধু একটা কুৎসিত ভয়াবহ বিকৃত অতীতের কঙ্কাল।

ভোরবেলা শিউবচন ঘুম থেকে উঠে দেখল ফুলবর্ষিয়া নেই। বাইরে এসে দেখল রামবচনের খাটিয়া শূন্য। ধ্বক করে উঠল তার বুকের মধ্যে। এদিক ওদিক দেখে ছুটে ঘরে এসে একটা কোণ থেকে পাথর সরিয়ে বের করল টিনের বাক্স। খুলে দেখল, টাকার থলিটা আছে। সেটাকে বুকে করে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সে সাধুদের কাছে গিয়ে পড়ল, 'হায় ভগবান কুত্তা ছুটো ভেগে গেছে।'

'অ্যাঁ!' সাধুরা হাসতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে একেবারে বিমর্ষ হয়ে গেল। শব-খেকো কুকুরের মত জুলজুলে চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। আজকে আর তারা হাসতে পারল না।

বাইরে একটানা ঝড়। সমুদ্রের ঝড় আর মুষলধারে বর্ষণের ঝাপ্টা।

দুই বন্ধু

—তোকে আমি শো'রের বাচ্ছা বলেছি।

যাকে বলল, তার একটি নিশ্বাস পড়ল ফোঁস করে!

যে বলল, তার সামনের দাঁতগুলি নেই। গতকাল রাত্রের এক চিমটি তামাক পাতা ছিল তার নিচের মাড়িতে গোঁজা। সেটুকু চুষছে এখনো। লালা গড়াচ্ছে তার বাসি মাংসের মতো চোপসানো ফাটা ঠোঁটের কষ দিয়ে। ভোরের আলোয় কী যেন খুঁজছে মাটিতে হাতড়ে হাতড়ে।

আবার বলল, বুডঢা, তোকে আমি গীদধরের বাচ্ছা বলেছি।

বুডঢার আবার একটি নিশ্বাস পড়ল ফোঁস করে। কালো গলিত পাঁকের মতো থলথলে নিচের ঠোঁট তার ঝুলে পড়ল। দেখা গেল, বুডঢার দাঁত নেই একটিও থলথলে কালো মাড়িতে।

যে বলল, সে যেন ডুব দিয়ে উঠেছে মানুষডোবা পাঁক থেকে। দলা দলা পাঁক গড়িয়ে, ঝুলে পড়ছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু, ওগুলি পাঁক নয়, গায়ের মাংস আর চামড়া। লোল-শিথিল শরীর বুড়োর, মনে হচ্ছে ওইরকম। চোখ দুটি গলা গলা, একটু শাদাটে। নজর যে বিশেষ নেই, তা বোঝা যাচ্ছে। খানিকটা ন্যাকড়া আছে গোঁজা তার কোমরে। তাতে লজ্জা ঢাকে নি, বুড়ো যেন অচেতন শিশু হয়ে উঠেছে!

সামনে একটি হেলে-পড়া ভাঙ্গা-বেড়া ঘর। মাথা নিচু করে, পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে বুডঢা। উপুড় হয়ে, হামা দিয়ে কী খুঁজছে বুড়ো। আবার বলল, তোকে আমি হারামী বলেছি, যা আমার দিল চেয়েছে। কখনো গোঁসা করে বলেছি, আবার সোহাগ করে বলেছি। এটা তামাম দুনিয়ার নিয়ম, একজনকে সে সবকিছু বলে। আমার বুড়িকে বলেছি, ব্যাটাকে বলেছি। কিন্তু ওরা যা,

তা-ই থেকে গেছে। তুই যে ছেরুয়া, সেই ছেরুয়াই আছিস। তাই না?

ছেরুয়া বুড়চার পাহাড়ে-শরীর আকুঞ্চিত হল একবার। পিচুটি-গলা চোখ দুটি উদ্দীপ্ত হল আরো। আর একটি নিশ্বাস পড়ল ফোঁস করে।

বুড়ো বলল, তবে। তুই আজ ফের তুক করেছিস। আমি লাঠি খুঁজে পাচ্ছি না। তুই যেদিন তুক করিস, সেইদিনই আমার লাঠি হারিয়ে যায়। হাঁ, তোকে আমি গালমন্দ করি। পেটাই ওই লাঠিটা দিয়ে। আমার বুড়িকে পিটিয়েছি, ব্যাটাদের পিটিয়েছি আর তোকে আজো পেটাই। কেন? না আমাকে একজন পেটায়। এটা দুনিয়ার নিয়ম। বুড়চা, তুই ভয় পাচ্ছিস মিছে। তোর তুক তুলে নে, লাঠিটা আমাকে বার করে দে।

ছেরুয়া বুড়চার সারা শরীর আকুঞ্চিত হল আবার ঘন ঘন। দন্তহীন কালো মাড়ির পাশে, ফাটা কালো জিভ দিয়ে নাক চেটে নিল একবার।

বুড়ো তখন ঢুকেছে বুড়চার পায়ের তলায়। বলল, পেয়েছি। তোরই পায়ের তলায় রয়েছে।

বুড়চার পায়ের তলা থেকে বেরিয়ে এসে, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। চোপসানো ঠোঁটের পাশ দিয়ে আবার গড়িয়ে পড়ল খানিকটা লালা। হাঁপ ধরে গেছে। সামলাতে হল খানিকক্ষণ সেই বাসি তামাকপাতাটুকু চুষে। যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত, চুষছে সারা দেহটাই। বলল, বুড়চা, তোর তুক টেঁকে না। কেন না, তুই ছেরুয়া। আমি মানুষ।

বুড়চার গলনালী থেকে একটা চাপা শব্দ বেরুল, আঁ।

হাঁ। আর এই লাঠিটা আমার দরকার। তোকে আর আমাকে দুজনাকেই চালাবার জন্যে দরকার।

বুড়ো তাকাল সামনের দিকে। কেউ নেই। সবাই বেরিয়ে গেছে সেই ভোররাত্রে। মেয়ে-পুরুষ গাড়ি বলদ-ছেরুয়া, টিন-বাঁক-

বুরুষ, সব চলে গেছে ধাওড়া থেকে। শুধু শুয়োর চরছে, বুড়ি বাচ্চারা ঘুরছে, বসে আছে।

বিষকাটারির ঝাড় আর ডোবা ছড়িয়ে আছে শুয়োরের জন্য। দূরের উচুনিচু টিলাগুলি পাহাড় নয়। কাগজকলের রাবিশ ফেলে ওইরকম হয়েছে। যেন শাদা পাথরের স্তূপ। তারপর একরাশ সবুজ লকলকিয়ে উঠেছে বাঁশঝাড় বেয়ে। আম-জাম নারকেলের সারিতে। তার ওপারেব আকাশে দেখা দিয়েছে একটু রক্তাভা।

বুড়ো বলল, সবাই চলে গেছে। আগে আমিও যেতাম, বুড়া, তুইও যেতিস্। এখন দেরি হয়ে যায়। আমরা দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি। এবার চল।

বুড়া সামনের পা'টি তুলল একবার। বাড়াতে পারল না। আবার তুলল, পারল না।

বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। এগুতে পারছে না। দুজনেরই কালো দন্তহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। বিলুলিত হল দুজনেরই শরীর।

এটা আমাদের মনের ভয়। আমরা দুজনেই ভয় পাচ্ছি। আমাদের বুকের মধ্যে বসে কারা দাপাদাপি করছে, ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আমরা বেঁচে আছি এখনো, রুটি বিচুলী খাই। তাই আমাদের যেতে হবে। কাজ করতে হবে। বুড়ো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, ছেরুয়া বুড়া!

সেই চিৎকার শুনে, বুড়া দুপা এগিয়ে গেল। বুড়োও এগিয়ে এল।

দুজনেরই চোখ দুটি সমান গোল। একই রকম পিচুটি আকীর্ণ গলিত সিক্ত চোখ। চিৎকার করেছে বুড়োই। কিন্তু দুজনেরই মনে হল, যেন আর কেউ হাঁক দিয়েছে। দুজনেই এগিয়ে গেল ঘরের পিছন দিকে।

সেখানেই রয়েছে মিউনিসিপালিটির ভাগাড়ের পুরনো গাড়িটা। গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ভেঙ্গে, মরচে পড়ে হা হা করছে

চারদিক। জোয়ালের কাঠ খেয়েছে পোকায়। চাকা ছুটি টালমাটাল আছে একরকম। তেল পড়ে না আর হুইলে, চলে কেঁদে ককিয়ে। এখন আর কোনো নম্বর বহন করে না গাড়িটা। ওটার আর কোনো অস্তিত্ব নেই মিউনিসিপালিটির খাতায়।

কারুর নেই। বুড়োরও নেই।

একদিন ছিল। আমার নাম ছিল গাড়ি-টানাদের হাজিরা খাতার সকলের ওপরে। আমি ছিলাম সর্দার, নাম ছিল বটুয়া। তখন ছিলাম মানুষ। এখন বুড়ো। আমার নাম গেছে খারিজ হয়ে। কিন্তু এখনো আমি কাজ করি, তাই আমাকে খাবার জন্যে কয়েকটা টাকা দেয় মিউনিসিপালিটি থেকে। তাই নিয়ে আমাকে খাওয়ায় শেখো মরদের বউ।

গাড়িটাকে দেখলে মনে হয় না চলে! জোয়ালটার ভার বেশি নেই। কিন্তু বুড়োকে তুলতে হয় কাঁধ দিয়ে। তুে ডাকে, বুডঢা আয়।

বুডঢা তাকাল উদ্দীপ্ত গলিত চোখে। ছানি পড়েছে, বুড়োর মতোই কালো মণি ছুটো ঘষা কাচের মতো শাদা দেখাচ্ছে! তার পাশে লাল জায়গাটুকুতে ভয় কাঁপছে থরথর করে। বিশাল কালো শরীরটা আর সম্মুখভেদী শিং ছুটি যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়ছে না, কান ছুটি কাঁপছে শুধু। এখনি হড়হড় করে লালা ঝরছে নাক দিয়ে।

বুড়ো আবার চিৎকার করে উঠল, আয়।

বুডঢা ছুবার চেষ্টা করল। সামনের পা ছুটো যায় তো, পিছনের ছুটো আসে না। তারপর পাছার ধাক্কায় যেন এগিয়ে দিল সামনেটা। ঢুকল জোয়ালে। বুড়ো বলল, হাঁ। তুই বুড়ো হয়েছিস্, তবু ভয় পাস। এবার চল।

হাজিরা নেয় না আর বুড়োর। তবু বুড়ো হাজিরা দিয়ে যায় একবার মিউনিসিপালিটিতে।

চাকাতে টান পড়তেই কে যেন কেঁদে উঠলো বুড়ো-গলায়, আঁ হো আঁউ……

বুড়ো বলল, হাঁ !

ওটা বুড়োর অভ্যাস। বুড্ঢার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, চাকা দুটি এক পাক খায়, আর কঁকায়, আঁ হো আঁউ…

বুড়ো বলে, হাঁ।

অর্থাৎ ঠিক চলছে।

শব্দটা শোনা মাত্রই, আশেপাশে শুয়োরগুলি উঠল ফোঁস ফোঁস করে। একদল বাচ্চা উঠল ছড়া কেটে চেঁচিয়ে,

ছেরুয়া ছেরুয়া ছেরু—য়া
তোকে তেল মাখাব কেড়ু—য়া।

বুড়ো বলল, হাঁ, তেল মাখালে ছেরুয়া খুব তাগুদে হয়। তোকে আমি মাখাতে পারিনি। কেন না, আমি নিজে কোনদিন মাখতে পাইনি। তোর নাম ছিল আমার সঙ্গে, মিসিপালটির এক খাতায়। বটুয়া সর্দার, এক গাড়ি, এক ছেরুয়া।

তুই ছিলি পাঁড়া, হতে পারতিস ভঁইসা। কিন্তু ভঁইসা গাড়ি টানে না, চাষ করে না, শুধু জন্ম দেয়, ঘোরে ভঁইসীর পিছে পিছে। সামনে কোনো ভঁইসা এলে সে লড়ে। হয় মরে না হয় মারে। মানুষ তোর কাছ থেকে জন্ম দেওয়ার মরদপানাটা নিয়েছে ছিনিয়ে তাই তোকে বলে ছেরুয়া। তুই জানিস না, এই দুনিয়া কাজের জন্যে তোর কাছ থেকে কী ছিনিয়ে নিয়েছে। যে সময়ে নিয়েছে, তখন তোর কিছু করার ছিল না। আমার নিলে, আমারো থাকত না।

দুধের দাঁত সবকটা পড়ার আগে তুই কাজে লেগেছিলি। এখন তোর জোয়ান বয়সের দাঁত নেই একটাও। আমার মত বুড্ঢা। তখন ছিলি আমার বুকে বুকে, এখন কাঁধে কাঁধে। ঠিক বুড়ো যখন ছিলি, তখন ছিলি হাড্ডিসার। এখন তুই বুড়ো নোস, তারো বাইরে। এখন ফুলে হয়েছিস ঢোল, পাগুলো হয়েছে সরু কাঠি। তাই তোর নামটাও গেছে খারিজ হয়ে। এক আঁটি

বিচুলী তোকে দেয় মিসিপালটি। কেন না, তুই কাজ করিস এখনো আমার সঙ্গে। এইটা নিয়ম।

ছেরুয়া, ছেরুয়া, ছেরু—য়া।

একটু একটু করে হারিয়ে গেল পিছনে বাচ্চাদের চীৎকার। সামনে রাস্তা। বৈশাখী সূর্য উঠে এসেছে খানিকটা। এর মধ্যেই ছড়াচ্ছে উত্তাপ।

বুড়ো চাকা গোঙাচ্ছে—আঁ হো আঁউ···

বুড়ো বলছে, হাঁ।···থামিসনে বুড়ঢা, চল। যেতে হবে বহুদূর। ঘুরতে হবে অনেক রাস্তা। ওই বুড়ো চাকা দুটো ডাকে, আমি ভাবি, তুই ডাকিস। বেলা যত বাড়ে, তত মনে হয়, ওটা আমারই গলা, আমিই ডাকি। আসলে ওটা আমাদের তিনজনের। তোর আমার, গাড়িটার। তিন খারিজের বেঁচে থাকাটা ও জানান দিয়ে যায় সবাইকে।

বুড়ো সারা মুখ কাঁপিয়ে চুষছে তামাকপাতা। বাসি পাতার স্বাদ নেই আর। কাগজের মত পানসে হয়ে গেছে। মাড়িতে মাড়িতে ঘষেও একটু রস পাওয়া যাচ্ছে না। তাই গিলতে ইচ্ছে করছে না, লালা গড়িয়ে পড়ছে কষ দিয়ে।

বুড়ঢার নাক থেকেও গড়াচ্ছে লালা। চলছে খুব আস্তে। এক পা ফেলে, আর এক পা টানতে সময় লাগে। হাড়ে হাড়ে জং ধরে গেছে। পা তুলতে গেলে হাটু বাঁকে না, খাড়া হয়ে থাকে।

বুড়ঢার পা ফেলাটা বোঝা যায়, যখন চাকা দুটো আঁ বলে খানিকক্ষণ থামে। তারপর হো বলে আবার থামে। পরে, হঠাৎ আঁ—উ শব্দটা সবচেয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। তখন পিছনের পা দুটো যায়।

বুড়ো বলে, হাঁ।···আমি ওই ডাক শুনি। আর দেখি একটা পাহাড় চলেছে আমার পাশে পাশে। একটা কালো পাহাড়, বাঁয়ে হেলে ডাইনে হেলে, ঢেউ দিয়ে চলেছে। পাছায় তার বড় বড়

পাথরের চাংড়া আছে খোঁচা খোঁচা হয়ে। তারপর উঁচু পাহাড়ের কোলে যেমন থাকে সমান জমি, তেমনি চলে গেছে তার পিঠ। আমার বুড়চা ছেরুয়া। ওর শিং দুটো আমার হাতের চেয়ে বড়। কখনো মনে হয়, একটা পেল্লায় কালো মেঘ চলেছে আমার পাশ দিয়ে।

কত বড়। তার পাশে, লাঠি হাতে আমি। মেঘ বল, পাহাড় বল, ওকে চালাই আমি। অথচ আমাকে দেখা যায় না ওর আড়ালে। দেখে নিশ্চয়ই ভগবান হাসে। কিন্তু চাকা কেন ডাকছে না। বুড়চা!

সামনের রাস্তাটি, নর্দমার কালভার্টের জন্য একটু উঁচু হয়ে উঠেছে। বুড়চা ঠেলছে, উঠতে পারছে না।

পারবি বুড়চা, পারবি। রোজ পারিস, আজো পারবি। আজ, হ্যাঁ আজ কি হয়েছে আমারো। আমারো মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার গাঁয়ের সেই পাহাড়ের মন্দিরটার সামনে এসেছি। ওইখানে মহাদেব আছে। এত উঁচুতো মনে হয়নি কোনোদিন এ রাস্তাটা। আমার হাঁটুর শিরে টান ধরছে। দুহাতে আমাকে লাঠি ভর দিতে হচ্ছে। তোকে আমি ঠেলতে পারব না।

ঠিক যাব, বুড়চা, এটা আমাদের মনের ভয়। আমরা দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি। ছেরুয়া বুড়চা···! আঁ···আঁ··আঁ হো··· আঁউ···

হাঁ।···এইটা ভগবানের হাসি, ওই রাস্তাটা। আমি দেখেছি ভগবানের হাসি। আমার প্রথম ছেলেটা মরবার আগে যখন ধনুকের মত বেঁকতে লাগল মেঝেয় পড়ে, দেখলাম ভগবান হাসছে। ধাওড়ার মারামারিতে যেদিন রামু চামলুর মাথাটা কোদাল দিয়ে ফাঁক করে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, দেখলাম ভগবান হাসছে। কেন, শেখোর বাচ্চাটার পাতের ভাত যখন শোরে এসে কপকপ খেয়ে ফেলতে থাকে আর বাচ্চাটা কাঁদে, আমি দেখি ভগবান হাসে। দিব্যি করে বলছি, দেখেছি। বুড়চা, তুই দেখতে পাস না।

শিউরে উঠল একবার বুড়টার সারা গায়ের চামড়া। ল্যাজটা আন্দোলিত হল বারকয়েক। ঘাড়ের কাছে কয়েকগাছি চুল উড়ছে ফুরফুর করে।

বুড়ো বলল, তুই ঠিক দেখতে পাস। তুই আমাকেই তুক করিস, যাতে আমি কিছুতেই উঠে না দাঁড়াতে পারি। মিছে তুক করিস। দুনিয়ার নিয়মের কাছে তুক চলে না।

রাস্তা ঘিঞ্জি হচ্ছে, শহর বাড়ছে। দোকানপসার ছেঁকে ধরছে রাস্তার দুদিক থেকে। সূর্য হাসছে দপদপিয়ে। বাতাস হালকা লাগছে একটু একটু। রাস্তাটা তাতছে ধীরে ধীরে। ধুলো উড়ছে থেকে থেকে।

গাড়ি-ঘোড়া-ভেঁপু। থামিসনে বুড়টা, এসবই তোব চেনা। মোটরের ড্রাইভার তোকে খিঁচোবে, রিকশাওয়ালা গালাগাল দেবে, বাচ্চারা ঢিল মারতে পারে, দল বেঁধে ভেংচাবে, আঁ হো আঁউ!—হ্যাঁ। সে শুধু তোকে নয়, গাড়িকে নয়, আমাকেও।

থামিস্নে। রাস্তাটাতো বেশ আলকাতরা-ঢালা পেয়েছিস, চলে চল্। ওই দেখা যায় মিসিপালটির অপিস। ওই লাল টকটকে ফুল, উড়ছে বাতাসে। তোর ভয় পাবার কিছু নেই, ওগুলি রক্ত নয়; ফুল। মনে হয়, যেন মাটির তলে আছে অনেক রক্ত, গাছে গাছে ফুটেছে বিন্দু বিন্দু হয়ে। তারপর ঝরে যাচ্ছে মাটিতে। সবাই ঝরে যায় একদিন।

এটা নিয়ম।

দাঁড়াল এসে মিউনিসিপালিটির ফটকের সামনে। সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন স্যানিটারী বাবু সাইকেলে হেলান দিয়ে। বললেন, আজো তুই বেরিয়েছিস্ বুড়ো।

কী আশ্চর্য কথা। ফোক্‌লা মাড়িতে, বলিরেখাঙ্কিত শিথিল গালে বুড়ো হাসল। কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে জিভ। মাঝে মাঝে এই রকম হয়। তোমার হাত, তোমার পা তোমার চোখ জিভ তোমার কথা শোনেনা।

জিভটাকে স্থির করে রাখল বুড়ো এক মুহূর্ত। লালা মুছে নিল হাতের চেটোয়। তারপরে বলল, হাজিরা দিতে হবে না?

বাবু বললেন ভ্রূ কুঁচকে, হাজিরা দিতে হবে?

হাঁ। তুমি যখন বাইরে আছ বাবু, হাজিরাটা নিয়ে নাও।

নিয়ে নিলুম।

হাঁ। ফিরে যাওয়ার সময় বুড়চার বিচুলী নিয়ে যাব।

নিয়ে যেও।

বাবু!

বল।

একটু দাওয়াই দিতে হবে।

কার? তোর?

না, বুড়চার।

স্যানিটারীবাবু তেলচিঠে টুপিটা মাথা থেকে খুলে, হেসে উঠলেন হা হা করে। তারপর ভারি অবাক হয়ে তাকালেন বুড়চার দিকে। বললেন, বুড়চার পেটটাতো রেল ইঞ্জিনেন মতো হয়েছে।

হাঁ।

কি খায়?

মিসিপালটির বিচুলী!

তাই খেয়ে এত বড়ো হয়েছে পেটটা?

না। ফুলে যাচ্ছে রোজ, একটু একটু করে।

স্যানিটারীবাবু তাকিয়ে দেখলেন, বুড়োরও হাত পা ফুলেছে, মুখ ফুলেছে। বললেন, তুইও তো ফুলে গেছিস্।

বুড়ো ভাবল, তা হতে পারে। এ সময়ে সবাই ফোলে।

বিশ্বের এক বিচিত্র বিস্ময় যেন দেখছেন স্যানিটারীবাবু। একবার দেখেন বুড়োকে, আবার একটু ফিরে দেখেন বুড়চাকে। বললেন, গুঁতোবে না তো রে। যে কালাপাহাড়, যেমন চাউনি। আর যা শিং বাবা।

না। ও যে ছেরুয়া। বয়েসকালে একটু আধটু বাগাতো। ওর আসল জিনিস থাকলে, আপনাকে ওইরকম কাছে ঘেঁষতে দিত না। এতক্ষণে আপনার লাস বাড়িতে রেখে আসতে হ'ত।

উল্লুক।

হাঁ বাবু।

কি দাওয়াই দিতে হবে।

ছুটো দাওয়াই। বুডঢার তেরোটা ঘা হয়েছে বাবু।

গুণে রেখেছিস ?

হাঁ। এই যে, লাল দগদগে ফটকের এই ফুলের মতো। এক—ছুই—তিন…মাছি ধরেছে। বুডঢা এখন আর তাড়াতে পারেনা।

আর কিসের দাওয়াই ?

ওর শরীলের সব কবজিগুলো জং ধরে গেছে। একটু মালিশ চাই।

মালকোচা-দেওয়া স্যানিটারীবাবু টুপি হাতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন বুড়োর দিকে। বললেন, ওই দাওয়াইগুলো তোর নিজের জন্যে চাইনে ?

বুড়োর ভয়, বুডঢা তার আগে মরবে। সেইজন্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। নিজের জন্যে চায়। বলে, এটা ছুনিয়ার নিয়ম। বলল, না।

স্যানিটারীবাবু মনে মনে বললেন, ব্যাটা এই ফটকেই না পড়ে এখুনি মরে।

বললেন, আচ্ছা যা, নিয়ে যাস।

বাবু, একটা বিড়ি দাও।

দিলেন একটি বিড়ি। বুড়ো সেটি ভেঙে, ছোট্ট এক টুকরো ফেলে দিল কষে। একটু নেশা চাই।

এসবই রোজকার ব্যাপার। বুড়ো বলল, বুডঢা, দাওয়াই বাবু দেবে না, ওইরকম বলে। চাকায় একটু তেল, তোকে একটু

দাওয়াই। কিন্তু তার দাম আছে। খারিজের খাতায় ওগুলো নেই। আমি জানি। তবু কেন বলি। বলতে হয়, কেন, না, আমি মানুষ।

সূর্য ক্রমে প্রচণ্ড হচ্ছে। চোখে আগুন, জটায় হলকা। মহামেদিনী কাঁপছে দাবদাহের ভয়ে।

তবু মানুষ ঘুরছে, পুড়ছে। ধূলো উড়ছে, মানুষ চোখমুখ ঢাকছে। আঙিনায় বারান্দায় সব জায়গায় তৈরী করছে ছায়া।

কিন্তু বুড়া, আমাদের এসব দেখলে চলবেনা, যেতে হবে আমাদের। চল্।

কাঁপছে এখনি বুড়ার নাসারন্ধ্র, ফুটো দিয়ে ঝরছে ঘাম। পিচুটি-গলা ভয়ার্ত চোখে গড়াচ্ছে জল। বুড়ো দেখল, শিংএর গোড়ায় পোকা কিলবিল করছে বুড়ার। তাই কাক বসেছে মাথায়। ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে পোকা।

বুড়ো, থামলে চলতে পারবিনে। আমাদের যেতে হবে দূরে।

আমরা কোথায় যাব? আমরা যাব ভাগাড়ে।

বুড়া শূন্য চোখে দূরে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল ফোঁস করে।

ভয় পাচ্ছিস্ বুড়া। কিন্তু এইটা আমাদের কাজ।

আমরা টহল দেব আমাদের এলাকাটা। যার নাম মিসিপালটির ওয়াড। পথে পথে পড়ে থাকবে যত মড়া, সবাইকে তুলে দিয়ে আসব ভাগাড়ে। এইটা আমাদের কাজ। কুত্তা, বেড়াল, ছাগল, গরু, ভইসী, ভইসা, ছেরুয়া···

তুই ভয় পাচ্ছিস বুড়া। মিছে ভয় তোর। সবাই যায়। কেউ যায় ভাগাড়ে, কেউ শ্মশানে কেউ কবরে। কিন্তু যেতে হয়। আমাকেও যেতে হবে একদিন শ্মশানে। তোকেও যেতে হবে একদিন ভাগাড়ে। আমি সঙ্গে যাব না, কেননা, তুই মরে গেলে, তোকে নিয়ে যাব কেমন করে।

তুই মিছে ভয় পাচ্ছিস। এ দুনিয়ায় এলে, থামবার জো-টি নেই, যেতেই হবে। এইটা নিয়ম।

আমাকে পোড়াবে, তোকে খাবে শকুনে। কিন্তু আমরা সেটা জানতে পারব না। চল্।

চলে না। বুড়ঢার গলিত মাড়ি ঝুলে পড়ছে। তেমনি তাকিয়ে আছে ভয়ার্ত ব্যাকুল চোখে, দীপ্ত রোদের দিকে।

বুড়োর মনে হল, গরম বাতাস তাকে ঠেলে দিচ্ছে ফটকের দিকে।

আজ বড় দম নিতে হচ্ছে। ঠেলতে হচ্ছে বারবার, চাড় লাগছে হৃৎপিণ্ডে। ছেরুয়াটা তুক্ করছে নাকি। মনে হচ্ছে যেন, ভগবান হাসছে।

বুড়ো প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, এই শো'রের বাচ্ছা, শুনতে পাচ্ছিস।

কে যেন হেসে উঠল হা হা করে। হঁা, এমনি করে সবাই হাসে। ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। আবার চিৎকার করে উঠল, ছেরুয়া—বুড়ঢা!······

আঁা—আঁা হো আঁাউ!

হঁা। তিন খারিজে ডাক ছেড়েছে।

দুজনেরই ছানিপড়া চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে রোদে। বড় রাস্তা পার হয়ে পড়ল পাড়ার মধ্যে। বাচ্চারা লাগল আবার পিছনে। কে একটা মরা ইঁদুর ছুঁড়ে ফেলল ভাঙা গাড়িতে, 'নে নিয়ে যা ভাগাড়ে।'

হঁা। কিন্তু বাচ্চারা, তোরা চড়িসনে। এ গাড়ি ভাগাড়ে যায়। ওটা কী রাস্তার কিনারে? মরা কুত্তা? না, ছেঁড়া বালিশ। ওটা ভাগাড় যাবে না ছেরুয়া, শুঁকে শুঁকে যা, যত মরার জঞ্জাল, সব নিয়ে যেতে হবে।

যদি সারা এলাকায় না পাই, তবু যেতে হবে। কেন? না, যদি সীমানার বাইরে কেউ পড়ে থাকে ভাগাড়ের জীব, তাকে ফেলে দিতে হবে ভাগাড়ে। তাই রোজ যেতে হয়। এটা আমাদের ডিপটি, অর্থাৎ কাজ।

আমরা জন্ম থেকে মরণে যাই। আঁতুড় থেকে ভাগাড়ে। এখানে সবাই বিয়োয়। ওই বউটা, ওই ভঁইসীটা, ওই কুত্তীটা। এই পথে রোজ আমাদের যাওয়া-আসা। রোজ দেখি, জীবনটা চলে অষ্টপোহর। মিছে তোর ভয় বুড়ঢা, সামনে চল।

সামনে বাঁক। আবার বাঁক। ছেরুয়ার বুড়ো পিঠের শির-দাঁড়া বাঁকে না। অনেকখানি জায়গা নিয়ে মোড় বেঁকতে হয়। বেধে যায়, পিছুতে হয়, আবার সামনে।

পথ এই রকম। বাঁকা···বাঁকা···বাঁকা। অনেক খানা খাদ পাবি বুড়ঢা, খবরদার! নেমে পড়িসনে। ওরা তোকে ডাকবে পরান জুড়োতে। জুড়োলে আর পারবিনে যেতে।

চাকার শব্দ ক্রমে বিলম্বিত হচ্ছে একটু একটু করে, সুদীর্ঘ নিঝুম দুপুরের বিলম্বিত লয়ের মত।

মাথা নুয়ে পড়ছে ছেরুয়ার। পেটের দিকটা আরো ফুলছে যেন। মাছি ভরে গেছে ঘায়ে। হড়-হড় করে লালা গড়াচ্ছে।

বুড়োর বুকের মধ্যে বিদ্যুতের চমক লাগছে।

কেন, কি হয়েছে আমার। উরতের শিরায় টান পড়ছে আমার, তামাকপাতাটুকু বেরিয়ে পড়তে চাইছে কষ বেয়ে। আমার ঘাম ঝরছে। কেন, আমার তো ঘাম ঝরে না আর।

খং করে কী বেজে উঠল। বুড়ঢার সম্মুখভেদী শিংএর ঠোকা লেগেছে লাইটপোস্টে।

বুড়ঢা ডাইনে বেঁকে চল। এখন কানা হলে চলবে না। একি তোর চোখ কোথায়? ভয়ে উলটে ফেলেছিস। তোর চোয়াল দুটো লালায় হড়কে যাচ্ছে। থামিসনে বুড়ঢা। আগুন উঠছে জমি থেকে। তুই খারিজ ছেরুয়া, খুরে তোর নাল লাগানো হয়নি অনেক দিন। আমার নাগরা কবে ছিঁড়ে গেছে। পুড়ছে পায়ের তলা।

সামনে আর একটি পাড়া। শেষ পাড়া। ওটি ডোমপাড়া। বুড়ঢা, রোজ তোকে অভিশাপ দেয়। তুই মলে ওরা চামড়াটা

ছাড়িয়ে নেবে। নেবে নেবে, তুই চোখ বুজে পার হয়ে চল। ওরা ছুরি শানাচ্ছে, হাসছে, দেখছে তুই কবে মরবি! চাকার ডাক শুনতে পাচ্ছিনে কেন। বুডঢা!

বুডঢার মাথার উপরে চলে গেছে জোয়াল। ফোঁস ফোঁস করছে। যেন কোন শত্রু ওর সামনে এসেছে, তাই দাঁড়িয়েছে রুখে। কিন্তু বুড়ো জানে, ও ভয় পাচ্ছে, বুড়োকে তুক্ করছে।

এই গীদ্ধরের বাচ্ছা!

লাঠি তুলল বুড়ো। ছেরুয়ার পেছনের পায়ে শিরে টান পড়েছে, এগুচ্ছে না বুঝি।

বুড়ো মারল লাঠি দিয়ে। একবার, দুবার, তিনবার, বারবার।

আমাকে মারতে হয়। প্রাণপণে মারতে হয়। না মারলে আমি চলতে পারব না! তুই আমার ছেরুয়া। ওরে শো'রের বাচ্ছা, মরে গেলেও তোকে মারব। মারব। ভীরু, মরণে তোর ভয়!

মারতে লাগল ঠাস ঠাস করে।

ছেরুয়ার চোখ দুটো প্রকাণ্ড হয়ে উঠল। গল-গল করে ঝরে পড়তে লাগল জল।

এই ··এই···এই!

দুটো ডোম এল। কেন মারছ এত। অবলা জীব।

বুড়ো দেখল, হাতে ওদের ছুরি আছে নাকি। মরলে ওরা ছুরি নিয়ে আসত।

মারতে লাগল বুড়ো। ডাক দিল, ছেরুয়া বুডঢা!······

আঁ — হো — আঁউ!

হাঁ।

বুড়ো তাকাল ডোম দুটোর দিকে। কিন্তু নিজে চলতে পারছে না। বলল, এই তোর তুক্। তুই এমনি করে আমাকে মারবি। এমনি করে।

বাতাস পাক খাচ্ছে, তপ্ত বাতাস। হাঁপাচ্ছে বুড়ো দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে আর চাকার লয়ে তাল দিচ্ছে, হাঁ। এবার তুই চল বুড়ো নইলে তোকে মার খেতে হবে। এখনো বেঁচে আছিস, চলতে হবে!

ফাটা থ্যাবড়া ঠোঁট বুড়োর ঝুলে পড়েছে। রোদ পড়ে, জিভটা দেখাচ্ছে শাদা। বুড়ো এগোল লাঠি ভর দিয়ে। কোমরের ন্যাকড়াটা অনেকখানি স্থানচ্যুত হয়েছে। বুড়ো এখন শিশু দিগম্বরের সামিল।

কাছে এল বুড়চার। মস্ত বড় কালো পাহাড় ঢেউ দিয়ে চলেছে। হাত দিল বুড়চার গায়ে।

সামনে মাঠের পথ। ওই রেল লাইন। তার ওপারে ভাগাড়। বৈশাখের রুদ্র কটাক্ষে কাঁপছে থর-থর করে।

পেটটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে বুড়চার। মাথাটা ঠেলে ঠেলে, তুলে তুলে এগুতে হচ্ছে। যেন পাহাড়ের খাদ থেকে, শিং-খোঁচা চুড়ো ঠেলে ঠেলে উঠছে। নাকের লালা সুতোব মত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে, হলদে ফেনায় ভরে যাচ্ছে থলথলে কালো পাঁকের মত কষ। চোখে জল।

তুই কাঁদছিস বুড়চা। কাঁদিসনে।

বুড়ো হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল। বুকে একটা হাত রাখল।

কাঁদিসনে বুড়চা। বুড়োদের কাঁদতে নেই।

কালো মেঘের মত বড় হয়ে উঠছে ছেরুয়াটা। মস্ত বড়, দলা-পাকানো বিশাল কৃষ্ণ জলধর। ঠিকরে পড়ছে চোখ। জল পড়ছে কোণ দিয়ে।

বুড়চা, চার বছর বয়সে তুই এসেছিলি আমার কাছে। তখন তোর দুধের দাঁত সব পড়ে নি। আজ তোর বয়স হল, এক কুড়ি আট। ছেরুয়া হিসাবে তুই আমার চেয়ে বুড়ো। পঁচিশ বছর ছেরুয়ার অনেকখানি। তুই এককুড়ি আটে পড়লি, তুই কেন কাঁদিস। তোর কেন মরণের ভয়।

তুই যেবারে এলি, তখনো আমি জোয়ান। আমার বুড়ির তখনো অনেক রং। তিনটে বাচ্চার মা হয়ে গেছে তখন। তবু, চোখে চোখ পড়লেই, মেয়েমানুষটার নজর আড় হয়ে যেত। চলত বক্না ভঁইসীর মত, আঁট ছিল ওইরকম। বাচ্চাগুলি ওর মরে যেত, আর ছুটত আমার পিছে পিছে। কেঁদে কেঁদে সোহাগ জানাত। জানতাম, বাচ্চা চায়। আমার মরদের শোক, ভাবতাম থাক, কি হবে আর! ওর মন মানত না। খালি কিনা খাঁ খাঁ করত। ভরে রাখতে চাইত। সবাই চায় ভরে রাখতে। ও ছিল এই এলাকার ঝাড়ুদারনী। কাজ ফাঁকি দিয়ে আসত ছুটে ছুটে।

একদিন পড়েছি এই মাঠের পথে। বউটা এল। এল তুমুল জল মাথায় করে। সেই প্রথম, আমি এই গাড়িটায়, বুড়ঢা, তোর গাড়িতে চাপলাম, বউয়ের কথায়। লোকজন নেই, ফাঁকা। তার উপরে বিষ্টি। ও তাকাতে লাগল ঘন ঘন, বিজলীহানা চোখে। বিজলী হানল ওর ফুলে-ওঠা নাকের পাটায়। আর কোমরে একটা এমন মোচড় দিয়ে বসেছিল। ও নয়, মরা ছেলের শোকটা-ই ওইরকম খেলার বেশ ধরে খেলছিল। আমি দেখলাম। কী বিষ্টি বুড়ঢা, তুই তখন জোয়ান ছেরুয়া। জল পেয়ে ছুটেছিস মহানন্দে। তখন তোর কোন ভয় ছিল না।

আমি বউটাকে আদর করলাম। ভালবাসলাম। তখন আমার একবার আবার মনে হয়েছিল, ভগবান হাসছে।

বুড়ঢা, শব্দ নেই কেন বুড়ো চাকার।

কিন্তু কালো মেঘটা তো ঠিক ভেসে চলেছে চোখের উপর দিয়ে। লালা দাগ রেখে চলেছে। ফেনা লালা গড়িয়ে, গলার তলা দিয়ে পা বেয়ে পড়ছে। একটা চাপা কাশির শব্দ যাচ্ছে শোনা।

বুড়ঢা, তুই কি মুখ থুবড়ে পড়ছিস? তোর মাথা, পেল্লায় শিং দুটো নুয়ে পড়ছে কেন? তুই কি চলছিস না? চোখ দুটো তোর এত চকচক করছে কেন?

আঁ-আঁ হো আঁউ।

হাঁ। ···চলছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না বোধহয়। কেন? রেললাইন পার হয়েছে। ওই যে দেখা যায় কালো কালো সারি সারি—ওরা শকুন। এই গাড়িটাকে, মানুষ আর ছেকুয়াটাকে ওরা চেনে। তাই ছুটে আসতে লাগল কাছে।

ও! ওইজন্যে বুড়চা তোর চোখ ওইরকম দেখাচ্ছে। ভয় পাচ্ছিস। নিশ্বাস ফেলছিস ঘন ঘন। মাথাটাকে তুলছিস। আমি দেখছি, পাহাড় উঠছে সমুদ্রের তলা থেকে। ভয় নেই বুড়চা, ওরা চেনা।

ভয়ংকর দুর্গন্ধ। হাড্ডি আর জানোয়ারের দাঁতশুদ্ধ চোয়ালে ছড়ানো ঘাস-পোড়া মাটি। শকুনের বিষ্ঠায় আস্তীর্ণ সর্বত্র। মাংসখেকো কালো পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

বাতাস এখানে ঘূর্ণী বাতাসে ডাক ছেড়েছে। সূর্যের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি এখানে ছাই করতে চাইছে পুড়িয়ে।

বুড়চা, সেই একদিন চেপেছিলাম গাড়িতে। আর একদিন, দশ মাস বাদে চেপেছিলাম। ভরা পেটে ব্যাথা নিয়ে বউটা এসে উঠেছিল গাড়িতে। গাড়িতে একটা মরা গাই, তার পাশে আবার বুড়ি কাতরাচ্ছিল। এইখানে এসে দেখলাম, বউটার একটা ছেলে হয়েছে।

ছেরুয়া বুড়চা, এই সংসার কী অদ্ভুত। দুনিয়ার আঁতুরঘরের কোল দিয়ে আসি মরার আসরে। সেইখানেও আঁতুরঘর করে গেল বউটা। আমার সেই ব্যাটা আছে বেঁচে। থাকে ভিন্‌দেশে। গাড়ি টানে। জোয়ান বউ, তার এখন দুটো বাচ্চা। তুই সব জানিস বুড়চা, সে আমাকে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তিন খারিজে রয়ে গেছি একত্রে। বুড়চা, তুই আমার ভাই আমার বন্ধু। তোর কেন ভয়? তুই কাঁদলে আমায় কাঁদতে হবে।

আগুন গলে গলে পড়ছে আকাশ থেকে। শকুনগুলি থেমে গেছে আসতে আসতে। কৌতুহলী উৎসুক চোখে দেখছে চেয়ে চেয়ে।

বুড়োর নাল কাটছে বুড্ঢার মতই। বুড্ঢা কাঁপছে থরথর করে। ঘনঘন নিশ্বাসে দেখছে শকুনের দিকে। পায়ে ধরছে কালো ডেঁায়ো পিঁপড়ে।

বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি চাকা ধরে। আর একহাতে হাতড়াচ্ছে মরা ইঁদুরটা। তুলে ফেলতেই মুখে করে নিয়ে গেল একটা শকুন।

চল্ বুড্ঢা। কিন্তু, তুই এত বড় হচ্ছিস কী করে। কী করে! বড় হচ্ছিস, মস্ত বড়, কালো পাহাড় হয়ে আকাশে উঠছিস। বুড্ঢা! তুক করছিস তুই আবার। একি, ভাগাড়ের চেয়েও বড় হয়ে যাচ্ছিস। থাম, নইলে মরবি পিটুনি খেয়ে। ফিরে চল।

চল।

লাঠিটা পড়ে গেল বুড়োর হাত থেকে।

কেন?

চাকাটা চলে যাচ্ছে আপনি-আপনি।

কেন?

LIBRARY

বুড়ো পড়ে গেল মাটিতে। চিত হয়ে পড়ল। গনগনে সূর্য জ্বলছে বুড়োর চোখে। বিড়ির টুকরোটা লেগে গেছে কষে।

বুড্ঢা, আমি তোকে ছাড়া কিছু দেখছি না। আমি দেখছি, সারাটা আকাশ ভরে তুই। আমি ভয় পাচ্ছিনে। দেখছি, তোর হাসি। এতদিন ভেবেছি, ভগবান হাসছে। এখন দেখছি সে তোর মুখে।

বুড়ো উঠল না আর। ছেরুয়াটা ছানিপড়া চোখে অবাক হয়ে দেখল বুড়োকে। দেখল শকুনগুলিকে! তারপর ঠেলতে লাগল নিজেকে।

আঁ·····আঁ-হো আঁউ।

বুড্ঢার মনে হল, বুড়ো বলছে, হাঁ।

হাঁ। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি বুড্ঢা, আঁ···হো—আঁউ। হাঁ। শুনছি······এখনো শুনছি।

বুড়ো এগিয়ে গেল। তারপর পাক দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়াল বুড়োর কাছে। মুখোমুখি। জোয়ালসুদ্ধ মুখটা নামিয়ে নিয়ে এল। ওর লালায় ভরে দিল বুড়োর মুখ।

দুটি চোখে দারুণ ভয়ার্ত অসহায়তা। দাঁতহীন কালো থলথলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ল বিরাট হাঁ থেকে। চোঁয়াল কাঁপছে, ফোঁস ফোঁস করছে। পেটটা ফুলে ফুলে উঠছে। মোটা কালো জিভটা বের করে বুড়োর নাকের কাছে নিয়ে চাটল একবার।

তারপর ফিরে তাকাল দূরের পথে। চোখ দুটি ভরে উঠেছে জলে।

বুড়োকে না মাড়িয়ে পার হল চার পায়ে। ঠেকে গেল চাকা দুটি বুড়োর গায়ে। ভাঙা গাড়ির চাকা, তবু চাকা। আর ভারি।

বুড়ো টানল।

আঁ......আঁ......আঁ। হো আঁউ !......

বুড়োর বুক আর পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল চাকা দুটি।

রৌদ্রের দাবদাহ কথা বলছে ঘূর্ণী বাতাসের গোঙানিতে।

বুড়ো অনেকখানি গেল, অনেকক্ষণ ধরে। চেনা পথ। রেল লাইন পেরিয়ে আবার দাঁড়াল।

যেতে পারছে না। কেউ যে চালাচ্ছে না। মারছে না, কথা বলছে না, তিন খারিজের একটা নেই। বোধহয় ভাবছে, উঠে আসবে আবার।

ফিরে দাঁড়াল। ছানিপড়া চোখে তাকিয়ে দেখল, কালো কি কতকগুলি হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে নড়ে চড়ে বুড়োকে ঘিরে।

যেতে পারছে না বুড়ো। ভয়ার্ত ব্যাকুল চোখ দুটি তুলে, কাঁপতে লাগল দাঁড়িয়ে। হাঁ করল কাঁপানো চোয়ালে। অস্ফুট শব্দ বেরুল, আঁ—।

ধরে নিতে পার, আমি একটি কবিতা লিখতে বসেছি। যদিও, ভাষার আমার সেই তীব্রতা নেই, অনুভূতির সেই অরূপ রূপের সঙ্গে আমার অবচেতন মনের কখনো মিলন হয়নি।

ভাবছিলাম, কী নাম দেব এই কবিতার। শূন্য বাগানের কান্না? না, কান্নার ব্যাপারটা কেমন আমার অগোচরেই থেকে গেছে, ওটা আসলে আমাকে কল্পনা করে নিতে হচ্ছে। সুতরাং, কল্পনাটা থাক, কবিতাটাই লিখি।

কান্নাটা যদি তবু কোন ফাঁকে শোনা যায়, তবে আমার কবিখ্যাতির মার নেই।

আসলে, শূন্য বাগানের বেদনা কিংবা কান্না কথাগুলি কোথায় পড়েছিলাম, নয়তো শুনেছিলাম। সেজন্যে অসঙ্কোচে বলে ফেলেছি কথাটি।

যাক সে সব কথা।

বাসা ছিল আমার, মফস্বলের সেই গ্রামটার বাগ্‌দীপাড়ার মুখে। ধর, পাড়াটা লম্বা পুবে-পশ্চিমে। আমি ছিলাম পশ্চিম মুখে, যেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাড়াটার নাম সদ্‌গোপ-পাড়া। মনে হচ্ছে, পুব থেকে পশ্চিমে এসে একটু যেন জাতে ওঠা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই গণ্ডগোলে। বাগ্‌দীপাড়ায় আসলে বাগদী আছে সাতঘর। বাকী সবাই যশোরের কুণ্ডু থেকে কোটালিপাড়া সমাজের ভট্‌চায পর্যন্ত। আর সদ্‌গোপ-পাড়াটাও তাই।

সুতরাং, আমি দুটি জাতের পাড়ার মাঝখানে ছিলাম না সজাত অজাতের সাক্ষী হয়ে। আর দশজনের মত, নিতান্ত এক বাসাড়ে। তবে দুটি রাস্তার মাঝখানে থেকে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়েছিল

দুটি পাড়ার সঙ্গেই। কাজের মধ্যে সারাদিন বাড়ি বসে থাকা আর পুলিশের লোক এলে জানান দেওয়া, আমি এখনো মৃত্যুবান নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাইনি। কেন না, দিনে একবার অন্ততঃ সেই সময়টা, পুলিশের লোক আসত। সরকার বিরোধী ব্যাপারে আমি কতদূর এগিয়েছি, জানতে।

যাক, সে সবও আলাদা কথা। যদিও পুলিশের কাছে তা আলাদা ছিল না। যে ঘরটায় বসে থাকতাম সারাদিন, সেটা ছিল রাস্তার দিকে দরজা। বলাবাহুল্য, দরজাটা বাগ্‌দীপাড়া মুখো। যে যাবে ওই রাস্তা দিয়ে, তার সঙ্গে একবার চোখাচোখি, একটু হাসি, কিংবা দুটি কথা এসব হবেই।

বুড়ো গোপাল বাগ্‌দী। গাছে উঠে নারকেল পাড়া আর গাছ ঝাড়ানোটাই ওর পেশা। বুড়ো যদি দেখত, বসে আছি গালে হাত দিয়ে, তবে অসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে, গাল থেকে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। বাইরে গিয়ে বলত, কদ্দিন বারণ করিচি অমনটি করোনি বাপু, তা' ছেলের দেখছি কথা কানে যায় না। ওকি, ছিঃ! ওটা অলক্ষণ যে।

বলে চলে যেত। এ আত্মীয়তাটুকু ছিল আমার গোটা পাড়া, প্রায় পুরো গ্রামটির সঙ্গেই। বামুন, কায়েত, বদ্যি, জেলে, মালো, বাগ্‌দী, মুচি সব মিলিয়ে ছিল প্রায় শ'দেড়েক ঘরের বাস। এখন সেখানে হাজার ঘরের বাস হয়েছে পূর্ব্ববঙ্গের লোক নিয়ে।

আমি অনেকদিনের বাসাড়ে। সম্পর্কটা হয়েছিল অনেকের সঙ্গে।

বিলে ঘরামির দিদিমা এসে বলত, নাওগো ছেলে, তোমার জন্যে আজ একপো দুধ এনেচি।

তারপর বাড়িয়ে দিত একখানি ফুলস্ক্যাপ কাগজ। নাতি বিলে থাকে চন্দননগরে, বাড়ি আসে না। কিন্তু দিদিমার সপ্তাহে একটি করে চিঠি দেওয়া চাই। এ-ও আজ নাগাড় তিন বছরের ঘটনা।

দশ সপ্তাহের চিঠির পরে, একপো দুধ আসে। সেটুকুও নির্জলা নয়। কিন্তু, ওটুকুও বুড়িকে দিতে হয়েছে কোন খদ্দেরকে না দিয়ে। ওটুকু ওর ভরণ-পোষণের একমাত্র মূলধন। যদি দুধ না নিতে চাই, তবে কান্নাকাটি শুধু বাড়াবে না। বুড়ি হলপ করে বলবে, তার এসব নেকাপড়া জানা গুণধর ছেলেকে সে জল মিশিয়ে দুধ দেয়নি। আর চিঠির বক্তব্য যদি লিখতে যাই, সে আর এক কাহিনী। সেটা এখন মুলতুবী রাখলাম।

আর একজনকে আমার চিঠি লিখে দিতে হত। তিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা যুবতী। এখানে থাকেন দেওরের কাছে। দেওরটি চটকলের ডিপার্টমেন্ট ক্লার্ক। মেয়েটি দেখতে ভালো, শুনতেও ভালো। কোন দুর্নাম তো ছিলই না, মুখের কথাগুলি শোনাতো করুণ আর মিষ্টি। বাপের বাড়ি বরিশালে। সেখানে চিঠি লেখবার জন্যে আমার কাছে আসতেন। লেখাপড়া নিজে জানেন না একেবারেই। দেওরের প্রতিও মন প্রসন্ন ছিল না। আর প্রতিটি চিঠির মধ্যেই একটি ভীষণ আকুতি থাকত, আমাকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পার, নিয়ে যাও। নইলে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

চিঠিতে এই সব কথা লিখে দিতে গিয়ে স্বভাবতই আমি বলতাম, সত্যি আপনার তো বড় মুশকিল। সেরকম যদি বোঝেন, আপনার দেওর তো আপনাকে পৌঁছে দিতে পারেন।

বলতেন, দেবে না।

আমি, কেন ?

বলতেন, কি জানি! ঠাকুরপো বলে, কে আমাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে।

সহসা একটি অসহায় মেয়ের দারুণ ভয়াবহ ও অপমানকর জীবনের ছবি ভেসে উঠত আমার চোখে। কিন্তু তিনি যদি এর বেশী আমাকে কিছু না বলেন, আমার বলাও সাজে না। সুতরাং নীরব থাকতে হত। অথচ, ওঁর দেওরকে দেখে যে খুব সংঘাতিক

একটা কিছু মনে হত, তা নয়। আর সত্যি, বউদি থাকতে কেনই বা সে হোটেলে-মেসে খেতে যাবে।

অবশ্য যদি, এর মধ্যে আর কোন অন্ধকার-কাহিনী না থেকে থাকে।

যাক সেসব কথা। এ ও আমার বিষয়বস্তু নয়।

একদিন সকালবেলা ঘরে বসে, একটি তীব্র কান্নার চীৎকার শুনতে পেলাম। কোন মেয়ে গলার কান্না। বাগ্‌দীপাড়া থেকে শোনা গেল।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কেতু মুচি। জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? কাঁদে কে?

ছুলালের বউ।

ছুলালের বউ?

হ্যাঁ। ছুলালটা যে ম'ল এখুনি

ছোকরা মিস্তিরী ছুলাল। এইতো সেদিন বিয়ে করেছে। এক বছরও হয়নি। জানতাম অবশ্য অসুখ করেছে। কিন্তু একেবারে মৃত্যু, ভাবতে পারিনি। এই তো সেদিন চন্দননগর থেকে বিয়ে করে নিয়ে এল। ভারী ভাব ছিল তার আমার সঙ্গে। যেমন ছিল কাজে দড়ো, তেমনি পারত হাসতে। বড্ডো হেঁকোডেকো ছিল।

কারখানায় কাজ করাকে ও বলত কল ঠ্যাঙ্গানো। আট ঘণ্টা কল ঠেঙ্গিয়ে এসেও, ছুলালকে দেখছি গাছে উঠে ডাব পেড়ে খেতে চীৎকার করে গান করতে, পুকুরে মাতামাতি করতে। পাড়াটার বুড়ো-যোয়ান, সবাই মনে মনে ওকে একটু হিংসেই করত। একজন ছাড়া, সে ছুলালেরই বন্ধু বিপিন। কারখানায় ছুলালের 'বয়' অর্থাৎ হেল্‌পার হিসাবে কাজ করত। বয়সে প্রায় সমান সমান, দুজনের ভারী বন্ধুত্ব।

ছুলাল বলত, কথা শুনে মনে হয়, দাদাবাবু তোমরা আমার জন্যে লড়ো।

শুনে আমার মনের মধ্যে উঠত কেঁপে। বলতাম, ছিঃ ছিঃ দুলাল, কেউ কারুর জন্য লড়ে না ভাই। আমরা সবাই লড়ি নিজেদের জন্যে। যে শুধু পরের জন্যে লড়ে আর লড়িয়ে হয়, তেমন বীরদের আমার বড় ভয় হয়।

আরো নানান কথা বলত। সে সবও থাক্। পাড়া ছেড়ে গ্রামে, দুলালকে চিনত সবাই। ও যে সব কিছুতেই আগে বেড়ে আছে।

কিন্তু সেই দুলাল, এই কদিনের অসুখে মারা গেল। সেই কালো কুচকুচে মুখ, এক মাথা কালো কোঁচকানো চুল, আর এক মুখ শাদা ঝকঝকে হাসি।

বিয়ে করে কতদিন বউ নিয়ে গেছে এখান দিয়ে। সে তখন নতুন বউ। আমি বসে কি লিখছিলাম। হঠাৎ দুলালের খ্যাকানি শুনলাম, আয়না। আহা হা, তোর আবার বেশী লজ্জা। জানিস্ আমাদের কত আপন মানুষ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। কত আর বয়স হবে। বছর ষোল-সতের। ওদের ঘরে একটু বেশী বয়স বৈ-কি। বললাম, কি দুলাল?

এই দেখ না, বলছি, তোমাকে একটা পেন্নাম করে যাক, তা লজ্জায় বাঁচছেন না। সাধে আর মেয়ে মানুষের উপরে মেজাজ বিগড়ে যায়।

ছিঃ ছিঃ, বোধ হয় দশদিনও বিয়ে হয়নি। এর মধ্যেই কী রকম করছে দুলালটা। বললাম, কেন তুমি ওকে শুধু শুধু ধমকাচ্ছে। যাও, নমস্কার করতে হবে না।

আমার কথা শেষ হবার আগেই, একরাশ সস্তা সিল্কের শাড়ি আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

সময়ও পেলাম না বাধা দেবার। দেখলাম একটি পুষ্ট-বলিষ্ঠ দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েব মুখ দেখা যাচ্ছে ঘোমটার আড়ালে। এমন কি লজ্জাচকিত দুটি বড় বড় চোখও। দুলাল হাতের সিগারেটটি নিয়ে যে কী করবে আমার সামনে, ভেবেই পাচ্ছে না। বিড়ি ও

হরদম-ই খায় আমার সামনে। সিগারেট কি না! সিগারেট খাওয়ার মত করেই, লজ্জিত হেসে (দুলালের আবার লজ্জা, সে যে কী অদ্ভুত) বলল, একটু বাইস্কোপে যাচ্ছি দাদাবাবু।

এরকম কয়েকবারই যেতে দেখেছি। বায়স্কোপে, সার্কাসে, মেলায়, সব বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে।

পাড়ার মেয়েরা (রিপোর্ট পেতাম বেশী বিলে ঘরামির দিদিমার কাছেই) বলত, দুলাল নাকি বেহায়ার মত বউয়ের সোহাগ করে। কারুর কি বউ নেই ঘরে, না, সোহাগ করে না বউ নিয়ে। দুজনের পিরিতের জ্বালায় নাকি গোটা পাড়াটার গায়ে বিছুটির ছপ্টি পড়ছে। হাসাহাসি, ঢলাঢলি, ছি! আর কী বউ বাবা! সোয়ামী না হয় একটু বেয়াড়া, তুই কি বলে পাল্লা দিস্ ওই মিন্ষের সঙ্গে। যে মিন্ষের নাম পাড়া ফাটানে দুলাল!

কেন জানিনে, দুলালের উপর ছিল আমার একটু পক্ষপাতিত্ব। মনে হত, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসটাইতো হবে একটু বেহিসেবী। সেটুকু যেমন না হলে নয়, পাড়ার এই কলঙ্ক রটনাটুকুও পড়ে গিয়ে যেন ওই বেহিসেবী রসের মধ্যেই। এটা ওটা দুটোই হবে, হয়তো হতেই থাকবে। বিশ বছর বাদে স্বয়ং দুলালই বলবে কোন পাড়ার ছেলেকে, ছোঁড়া বড় বেয়াড়া।

সেই দুলাল হঠাৎ মারা গেল। বেচারীর মা-বাবাও নেই। মা মারা গেছে বিয়ের বছর তিনেক আগে।

জামাটি গায়ে চাপিয়ে গেলাম। সেই মাটির দেয়াল, খোলার চাল। জানালাহীন সুড়ংএর মত অন্ধকার ঘর। দরজার সামনে দুলাল। সেই মুখ, সেই চুল, তেমনি ঋজু শরীরটি। বুকে মুখ দিয়ে পড়ে আছে বউ সুবাসী। সেই ঘোমটা নেই, লজ্জা নেই। আঠারো বছরের মেয়েটা, কালো চুল এলিয়ে মাথা কুটছে দুলালের শক্ত কালো বুকে। পাড়ার মেয়ে মানুষেরাও এসেছে সবাই। বোধ হয় অনেকেই ভাবছিল, তাদেরই শাপমন্যিতে জলজ্যান্ত ছেলেটার এরকম হল কিনা।

সুবাসী একবার আমার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর দুলালের থুৎনিটি নেড়ে বলল, শুনছ, ওগো, তোমার সেই দাদাবাবু এয়েছেন।

মনে হল, আমার বুকের ভিতরে একটা ফানুস ফুলতে লাগল ফাটাবার জন্যে। সুবাসী তেমনি করেই বলল, এবার তুমি কার সামনে দিয়ে আমায় নে' যাবে, আর বলবে, আমাদের দাদাবাবু, বউ পেন্নাম কর।

তারপর চীৎকার করে উঠল, আমি আর কলের বাঁশী শুনব না গো!

কলের বাঁশী! ওই বাঁশী দুলালকে ডেকে নিয়ে যেত, আবার দিয়ে যেত ফিরিয়ে। সত্যি, আর ও সেই বাঁশী শুনবে কেমন করে।

জামরুল তলায় বিপিনকে বললাম, কি হয়েছিল বিপিন।

বন্ধুর শোকে ওর স্বর ফুটছে না। বলল, কী জানি, বুঝলাম না দাদাবাবু। তিনদিন ধরে বলল খালি বুকে ব্যাথা। কাল রাত্রে ডাক্তারবাবু এসে বললেন, বুঝতে পারছিনে। বুকের একটা ফটো তুলাতে হবে। তারপরে, রাত না পোহাতেই, এই।

আশ্চর্য! দুলালের মত শক্ত ছেলের এমন মৃত্যু।

হঠাৎ বিপিন বলল, কিন্তু দাদাবাবু, এদিকে যে কিছুই নেই।

কিছুই নেই মানে?

পোড়াবার টাকাও নেই।

সে কি?

ওই, বলে কে! বউ বলছে, কার কাছে টাকা রেখে দিত। শ'চারেক নাকি ছিল। মরবার আগে বলে যেতে পারেনি। কোনদিন কাউকে বলেওনি।

ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। তবে, এই মেয়েটার কী হবে।

যাক্, সে সব পরের ভাবনা। পাড়ার সবাই মিলে কিছু টাকা সংগ্রহ করা গেল। তারপর শোনা গেল, দুলাল বাগ্‌দী নয়, হাঁড়ি।

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত শ্মশান যাত্রা আটকাল না। ইতিমধ্যে চন্দননগর থেকে এসেছে সুবাসীর এক পিসী। শ্মশানেও গিয়েছিলাম। সেখানেই পিসীর কান্নার মধ্যে শুনতে পেলাম।

এই ভরা বয়সে আমার এ কী হল গো। আমি এখন কত খাব, পরব, দেখব—

'আমি'র এই প্রথমপুরুষ আসলে ভাইঝি সুবাসী। দেখলাম, সুবাসী চীৎকার করে কেঁদে উঠে, আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে পিসীকে।— রাক্ষুসী, যা তুই আমার সামনে থেকে। যা······!

গতিক দেকে সত্যি পিসী সরে গেল।

ফোলা ফোলা লালচোখ সুবাসীর। পিঠময় ছড়ানো চুল। ওর এত অসহায় কান্নার চারপাশেও যেন কী এক দুর্দৈব আসছে ঘিরে। তাই আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি, সুবাসীর জলে ভেজা চোখে।

ব্যাপারটা তখনো বুঝিনি পরিষ্কার। চিতার জলে সব সাঙ্গ হল। সুবাসী সিঁদুর মুছে থান পরল। প'রে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চিতাটার দিকে।

তারপর বাড়ি ফেরার সময়, পিসী বলে উঠল, আর ওপাড়ার দিকে যাওয়া কেন? গঙ্গা পার হয়ে ওপারেই চল্। এপারে আর তোর কে আছে?

বটতলাটিতে দাঁড়িয়ে, আঠারো বছরের সদ্য বিধবা সুবাসী বলল, পিসী, পিসেকে নিয়ে কত বছর ঘর করেছিলি, তবু কি তুই বুঝিস্‌নি? না বুঝেছিস্ তো পালা, নইলে মুখ বুজে সঙ্গে চল্। থাকবি আমার সঙ্গে, যেমন করে হোক্ তোকে দুটো খাওয়াব।

এই জলে ভেজা কথাগুলির মধ্যে কী এক অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ছিল। পিসী তো দূরের কথা, সুবাসীকে নতুন করে দেখলাম আমি। দেখলাম, নতুন করে দুলালের সেই হেঁকোড়েকো ভালবাসা।

এবার আমাকে বললে সুবাসী, দাদাবাবু, পেটভাতায় একটা

কাজ যোগাড় করে দাও, আর মাস গেলে দশটা টাকা। ঘরভাড়া, পিসী, সবই তো আছে।

কিছুদিন বাদে, কাজ হল। এক জায়গায় নয়, তিনটি বাড়িতে ঠিকা কাজ। মাস গেলে গোটা তিরিশ পাবে।

দুলালের মৃত্যুর পর, সেই বিধবা মহিলা চিঠি লেখাতে এসে, প্রথমেই বললেন, আপনি অনেক করলেন মেয়েটির জন্যে। আহা! ওইটুকু মেয়ে।

উনিও অবশ্য সুবাসিনীর চেয়ে খুব বেশী বড় হবেন না। যাই হোক, পরমুহূর্তেই বললেন, লিখে দিন, 'ছিচরণেষু, বাবা, বুঝলাম, আমার মা-বাপ্ নেই, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। এই দেওরও ততদিন আছে, যতদিন বিয়ে না হয়। বিয়ে হলে তখন আমাকে দূর দূর করবে। আমার এই জন্মের সাধ-আহ্লাদ সবই ফুরিয়েছে। বাকী আছে পরের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া ইত্যাদি।'

আমার হৃদয় ও মন বলে কিছু আছে কিনা জানিনে। কথাগুলি লিখে দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না।

রোজ, দু'বেলা দেখি, সুবাসী যায় আসে আমার সামনে দিয়ে। শাদা থান পরে, ঘোমটা দিয়ে, মাথাটি একদিকে হেলিয়ে। এখন আর মুখ ঢাকেনা ঘোমটায়।

পৌষের শীতে মারা গেল দুলাল। এখন বাতাস বইছে রোজ। ন্যাড়া গাছগুলি ভরে উঠছে কচি পাতায়। রোজ একটু একটু করে ছেয়ে যাচ্ছে সবুজে। পাখীপাখালীরা শীতের আড়ষ্ট ডানা খুটে খুটে পুরনো পালক ঝাড়ছে।

আর দিনে দিনে কৃশ হচ্ছে সুবাসী। ও যে মাথা নীচু করে যায়, তবু বুঝতে পারি, একবার ওর মধ্যেই আড়চোখে তাকিয়ে যায় আমার দিকে। মুখটি রোগা হয়ে গেছে, চুলগুলি হয়েছে শননুড়ি। সারা মুখের মধ্যে চোখ দুটি যেন ভরে আছে সবটা। হঠাৎ দেখলে আর বয়স বোঝা যায় না।

রোজই শুনি ঝগড়া হয় পিসীর সঙ্গে। পিসী বলে, কেন

মরবি এমনি করে ? সোমসারে কি ছেলে নেই। কত জনায় হাত বাড়িয়ে আছে পাবার জন্যে।

প্রথম প্রথম মারতে গেছে সুবাসী পিসীকে ধরে। তারপর গাল দিয়েছে, পিসী, তোর মরণ আছে আমার হাতে।

পিসী বলেছে, তাই মার তবু তোর এই মরণ আমি দেখতে পারিনে আর। এখন আর কিছুই বলে না সুবাসী।

তখন একদিন সেই বিধবা মহিলা আমাকে বলেছিলেন, জানেন, সুবাসীর পিসী বেটী অসতের শিরোমণি। অমন মেয়েটির মাথা খেতে চাইছে।

আমার যেন মনে হত, সুবাসী যখন যায় আমার সামনে দিয়ে, ওর চলার মধ্য দিয়ে যেন বলে যেত আমাকে, দেখছ তো দাদাবাবু, কেমন করে পেছন লেগেছে সব। ওরা জানেনা, কার বিধবার সঙ্গে এমনি করছে। তুমি তো জানো সেই লোককে।

সত্যি, একলা পিসী নয়, অনেকেই লেগেছে ওর পিছনে। সুবাসীর যৌবন, শ্রী, সবই চোখে পড়বার মত। কিন্তু সে সবই যে ছিল ওর দুলালের জন্যে।

তবু ওর ওপর যে লোকের টান, তার সবটুকুই আমার কাছে দোষের বলে মনে হয়নি। কিন্তু সুবাসীর মনের কথা মনে হলে, নির্বাক বেদনায় আমাকে শুধু চেয়ে থাকতে হত।

সুবাসী যে এখনো সেই ঘরেই থাকে। আজো শোনে সেই বাঁশী। বোধ হয়, ওই বাঁশী শুনেই ও এখন লোকের বাড়ি যায় কাজ করতে।

বিলে ঘরামির দিদিমা একদিন এসে বলে গেল, বাবাগো বাবা, দুলালটা মরেও বউটাকে ছেড়ে যায়নি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

বিলের দিদিমা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, আতু ভট্‌চাযের বিধবা মেয়েটা কাল রাত্রে পেট খসিয়েছে, তাই নিয়ে এখন থানা পুলিশ হচ্ছে, আর সুবাসীটা শুকিয়ে মরছে দুলালের জন্যে। বলে, দুলালকে নাকি দেখতে পায়। এও আবার ভাল নয় বাপু।

কিসে যে সুবাসীর ভাল, সেটাই আবিষ্কারের জন্য গোটা পাড়ার সবাই ভাবছে।

কিন্তু সুবাসী কি ভাবছে, কেউ জানে না। আতু ভট্চাযের মেয়ের সঙ্গে যে তুলনা হয়েছে, তার কারণ আর কিছু নয়। দেখ, সুবাসী তার চেয়ে কত বড়।

সুবাসী যে ছোট নয়, তা' আমি জানতাম। আতু ভট্চাযের বিধবা মেয়েটার অতবড় পাপের মধ্যেও ব্যাথাটুকু তো আমি ভুলতে পারিনে।

একদিন গাল থেকে আমার হাত নামিয়ে দিয়ে, বুড়ো গোপাল বললে, কি ভাবছিলে বল দিকি।

সত্যি কথাই বললাম, তোমাদের সুবাসীর কথা ভাবছিলাম। একগাল হেসে বলল গোপাল, যে গাছ নারকেল দেয়, তাকেও চোখে পড়ে, যে না দেয়, তাকেও পড়ে। কেন? না, গাছটার হল কি? এমন শুকোচ্ছে কেন? অমনি তদ্বির আরম্ভ হয় গাছের। তোমরা যে সবাই ভাবছ, তা এই জন্যেই।

বললাম, গোপাল দাদা, গাছ তো মানুষ নয়।

গোপালের বুড়ো চোখে অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা। বলল, মনের কথা বলছ তো? গাছের বুঝি মন নেই? ভূঁই ফুঁড়ে সে দাঁইড়ে আছে, শিকড় বাড়িয়ে মাটির রস খেতে তারও মন চায়। নইলে সে গাছ কেন? ওটা যে জীবের ধম্মো। তবে হ্যাঁ, যেমন জীব তার তেমনি পথ।

গোপালবুড়োর কথার মধ্যে কী একটা অদৃশ্য সত্য ছিল, যে সত্যটার সামনে আমাদের গোটা জীবনটা বেঢপ বিকৃত মনে হতে লাগল।

আবার বছর এসেছে ঘুরে। মাঘ মাস যাচ্ছে। শীতটা পড়েছে মন্দ না। গাছগুলির পাতা গেছে ঝরে। পুকুরের জলে

জলে ধরেছে টান। উত্তরায়ণের পথে দিনগুলি বড় হচ্ছে একটু একটু করে।

তিনদিন বাদে ফিরলাম কলকাতা থেকে।

সন্ধ্যাবেলা দেখলাম, সুবাসী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সুবাসীর কৃশ শরীরখানি আবার পুষ্ট হয়েছে। কালো রং হয়েছে চিকন কৃষ্ণ। চুলেও চিরুণী পড়েছে।

কতদিন যেন দেখিনি সুবাসীকে। জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর সুবাসী

এ সেই শোকাচ্ছন্ন বিরহিনী সুবাসী নয়। একটু হেসে মাথা নীচু করে বলল, আপনার সামনে দু' দণ্ড আসতে ইচ্ছে করে। নিজের কাজ, আপনারও কাজ, তাই আসতে পারিনি।

বললাম, যখন তোমার ইচ্ছে হয় এসো।

চলে গেল। অবাক হলাম, কষ্টও হল। হয় তো দুলালের কথা শুনতে চাইছিল আমার মুখ থেকে।

আর একদিন দেখলাম, সুবাসীর হাতে কাচের চুড়ি। আর একদিন, গলায় দেখলাম, দুলালের দেওয়া রূপোর হারখানি। তারপরে একদিন, পেতলের দুটি টব কানে।

সুবাসীর শ্রী ঢলঢল হয়ে উঠল। কালো রূপসীটির চলায়-ফেরায়ও কেমন একটি বিচিত্র ছন্দ লেগেছে।

যত অবাক হই, ততো ভাল লাগে। অথচ মনের মধ্যে একটা ভীষণ অস্বস্তিও বোধ করি।

বছর গেল ঘুরে। বাতাসে শুনি সাগরের গর্জন।

বিপিন এল একদিন। দুলালের হেল্‌পার, সাকরেদ, বন্ধু। বলল, দাদাবাবু, ওস্তাদের মিস্তিরির পোষ্ট্‌টা আমি পেলাম।

খুশি হয়ে বললাম, বটে ?

হ্যাঁ। তবে মনটা বড় খারাপ। দুলুদা থাকলে, ওর সবচেয়ে আনন্দ হত। হাতে করে মানুষ করেছে আমাকে।

কিছু না ভেবেই হঠাৎ বলে ফেললাম, ভালো হয়েছে বিপিন। একটি কথা, মাইনে তো বাড়ল ?

হ্যাঁ, নতুন তো। এখন সত্তর টাকা হপ্তা।

বললাম, যদি অসুবিধে না হয়, দরকার পড়লে, সুবাসীকে তুমি দু' এক টাকা মাঝে মধ্যে সাহায্য করো।

বিপিন এক মুহূর্ত চুপ করে কী ভাবল। তারপর হঠাৎ বলল, ওসব সাহায্য-টাহায্য আমি কাউকে করতে পারব না দাদাবাবু, সোজা কথা। ওসব বাবুগিরি আমার নেই।

আমি রীতিমত ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ। আর বিপিন কয়েক মুহূর্ত ছটফট করল, কিছু একটা বলবার জন্যে। তারপর চলে গেল।

ভীষণ রাগ হল আমার। ওস্তাদের প্রতি কী ভক্তি, আহাহা। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হল, বিপিন বোধ হয় কোন কারণে সুবাসীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে। সাম্প্রতিককালের সুবাসীকে দেখে আমারও যে বড় অস্বস্তি কিনা!

দিনে দিনে বদলাচ্ছে সুবাসী। আজকাল যেন লক্‌লক্ ঢলঢল করছে। সুবাসীর এমন রূপ দুলাল থাকতেও দেখিনি।

হঠাৎ একদিন ছুটির বিকেলে বাগ্‌দীপাড়ায় অসম্ভব চীৎকার শুনতে পেলাম। প্রায় মার-দাঙ্গা আর কি।

বিপিনের বাবা কড়ি বাগ্‌দীর গলাটা সবচেয়ে চড়া। বলছে, তোর মত ছেলেকে আজ কচুকাটা করব রে, কচুকাটা। খবরদার, যদি আর ওকথা মুখে আনবি—

শুনতে পেলাম বিপিনের গলা, মিছিমিছি চেঁচিওনা বলে দিচ্ছি। তোমার ঘরে থাকব না। কোম্পানীর লাইনে গে বাস করব।

কড়ি, চোপ্, চোপ্ শুয়োরের ছেলে, আমাকে পিরিত দেখাতে এসেছ ?

মনে হল, ওদিকে সুবাসীর পিসীও মরাকান্না জুড়েছে। হঠাৎ হাসি শুনে চমকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দরজায় গোপালবুড়ো। বলল, কী শুনছ ?

জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার গোপালদাদা?

গোপাল হেসে বলল, ওই শুনছ না? গাছের শুকনো ডালপালা ঝাড়াই হচ্ছে, তাই এত শব্দ।

শুকনো ডাল ঝাড়াই হচ্ছে?

হ্যাঁ গো! নতুন ডাল গজাচ্ছে, পাতা বেরুচ্ছে। শুকনোগুলোন ভাঙ্গছে, ছড়াচ্ছে। একটু শব্দাশব্দি, একটু নোংরা তো হবেই।

বলে গোপালবুড়োর কী হাসি। ডায়লেক্‌টিকে বলে, আলো থাকলে আঁধার আছে। আমার মন ধাঁধিয়ে গেল সেই আলো আঁধারিতে। বললাম, একটু খুলে বল গোপালদাদা।

আবার খুলে কি গো। তোমাদের বিপিন আর সুবাসী ঘর বাঁধছে একসঙ্গে।

সহসা যেন প্রচণ্ড চপেটাঘাতে পাংশু হয়ে গেলাম। বিপিন সুবাসী!

গোপাল বলল, কী খারাপ লাগছে।

খারাপ লাগছে কি না, বুঝছিনে। ভালো লাগছে না।

গোপাল বলল, ঘরের দাওয়া নিকিয়ে রাখ, কেউ কিছু বলবে না। ক্ষেত জমিন নিকিয়ে রাখেনা কেন। সে কি তোমার দেখতে ভাল লাগে? না কি ভাল লাগে ঢ্যালা ছড়ানো মাঠ দেখতে। সোমসারের নিয়মে মানুষ গেরো বাঁধে ভালোর জন্যে। কিন্তু মন্দও কম হয় না। তখন ফস্‌কা গেরো ছিঁড়ে যায়।

কেন জানিনে, শেষ পর্যন্ত সুবাসী আর বিপিনকে আমি আর আলাদা করে ভাবতে পারিনি। পরে বুঝেছিলাম, কেন বিপিন সাহায্য করতে চায়নি। তখন বোধ হয় সে শূন্য বাগানে ফুল ফোটাচ্ছিল। একজন দাবী করবে আর বিপিন দেবে সঁপে, সাহায্যটা এখানে অপমান বৈ কি! শূন্য বাগানের কান্নাটা আমি শুনতে পাইনি। আসলে ওটা কান্না তো নয়, হরিতের অভিযান।

কিছুদিন পর। বসে লিখছিলাম। ছুটির দিনের দুপুর। হঠাৎ

একটি মিষ্টি ধমক শুনতে পেলাম, আহা, তোকে যেন দেখেনি কোনদিন দাদাবাবু। আয় না।

তাকিয়ে দেখি বিপিন। পাশে ধবধবে শাদা কালোপাড় শাড়ি। কুচিয়ে পরে দাঁড়িয়ে আছে সুবাসী। ঘোমটা তত নেই। পায়ে শ্লীপার।

বলতে যাচ্ছিলাম, থাক না। কিন্তু তার আগেই কালোপাড় শাড়িখানি লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে।

বড় সঙ্কোচে আর লজ্জায় সরে গিয়ে তাকালাম সুবাসীর দিকে। সুবাসীকে যেন আরো বলিষ্ঠ সুন্দরী মনে হল।

বললাম, কোথায় যাচ্ছ তোমরা।

দেখি, দুজনেই মিট্‌মিট্ করে হাসছে। বিপিন বলল, বল্ না। সুবাসী বলল, তুমি বল।

বিপিন বলল, বুড়ো বয়সে পড়তে যাচ্ছি দুজনে। আমাদের ইউনিয়নে একটা স্কুল হয়েছে, ছুটির দিনে লেখাপড়া শেখায়। তাই যাচ্ছি।

হঠাৎ আজ আবার আমার বুকটা ফুলে উঠল ফানুসের মত। হ্যাঁ, জলই আসছিল আমার চোখে।

পাশাপাশি চলে গেল দুজনে।

এলেন সেই বিধবা যুবতী ভদ্রমহিলা। হাতে কাগজ, চিঠি লেখাতে এসেছেন। এসেই বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে, দেখছিলাম জানালা থেকে। ছি! কি সাহস বিপিন-সুবাসীর। আবার আপনার কাছে এসেছে। অসভ্য কোথাকার!

তারপর, নিন্, লিখে দিন, ছিচরণেষু— মা, আমি আর এ জীবনের ভার সইতে পারিনে।——

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে—এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে। বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা।

যেন তীব্রস্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তর্‌তর্‌ করে।

ছুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই ছুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু-ধু করছে ইঁট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে, ইঁট পোড়াবার মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলে নৌকারও তেমন ভিড় হয়নি এখনো। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বন ঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাট করে কাপড় পরা। গোঁফ জোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম রোঁয়াটে ভাব যায়নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানেনি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের

মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। হা হা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে তুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই!

গাঁয়ের মানুষ নন্‌কু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দ্দার। তু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চড়িয়ে পেট ভাতায় ছিল তুটিতে গাঁয়ে। নন্‌কু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে তুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্‌রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের তুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোন অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল তুটিতে নন্‌কুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা! তুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজকার করেছে মাসে।

দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে তুটিতে। কাজ নেই। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙ্গড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। নন্‌কুকে বলল, কেন কাজ নেই?

নন্‌কু বলল, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বলল, তবে কি হবে?

কি হবে! নন্‌কু বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গীদ্‌ধরের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল নন্‌কুর কান্নায়, রোহ, রোহ, তু তু তু, রহো সর্দার, ন রো। তুমি ভালো মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে চুপ করে গেছল? নন্‌কু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনোরকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজো এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহরের মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাঙড় বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে-পড়া কুকুরের মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল

আরো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল! ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভাঁটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময়ে এল সেই জানোয়ারগুলি পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এল কালো কুঁত্‌কুঁতে চোখো, ছুঁচলো মুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল!

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। দুটি সামনের দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবত ধাঙ্গড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পারে?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকার বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরো খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের শাঁসের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হু দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপর বলল সোনার মাকড়ি, কাজ করবি?

কাজ। কাজ মানে খাওয়া! ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল, পুরুষটি বলল, কি কাজ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ্। ভরা দরিয়া, আরো বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে! ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুয়োরগুলির পাশে পাশে। ওটিই নিয়ম। কিন্তু সোনার মাকড়ি সেদিকে ঢু-ঢু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তাকাল দরিয়ার জলে। তারপর শুয়োরগুলির দিকে। কালো কিম্ভুত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজী হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কসুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু

কেড়ুয়া তেল, দরিয়ার থেকে উঠে গায়ে মাখার জন্যে। একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজী হয়ে গেল দুটোতেই? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনকে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরর্ হয়ে গেল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ-র্ র্-র্-র্-র্-আ···

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ···হুঃ! আ···হুঃ! যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চক্‌চক্ করে উঠল কুঁত্‌কুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই গায়ে গায়ে। গায়ে গায়ে সবাই ঠিক জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ-র্-র্-র্-র্-আ-উ-র্-র্-র্-আ···

আ···হুঃ! আ···হুঃ!

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চক্‌চকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ারগুলির মতো গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী

ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্ বাগ। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে খরবেগে তর্তর্ করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, একজায়গায় থুকথুকিয়ে উঠেছে কালো কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

ওরা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া!···

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে!

পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হাঁ, বহুৎ বড়!

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত? পুরা রুপয়ার বেশি না কম?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রুপয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন।

কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখ্‌লিফ পরোয়া করে না।

ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে শুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী। হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে! গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনটা পাঁচটা দেয়, কোনোটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো!

পাবে। নয়া গাভিন। এখনো হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকম ফেরে। তাড়া দেওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ-ই—হা—হা···

মেয়েটা টান দিল, উ-র্‌-র্‌-র্‌— আ,—উ-র্‌-র্‌-র্‌-আ···

জানোয়ারগুলি হটাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে

লাগল। ভাবখানা এ সবের মানে কি? গায়ে গায়ে ঘষার একটা খস্‌খস্‌ শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোনো খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আল্‌তোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে উনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কল্‌ কল্‌ করে। বাড়ছে। আরো বাড়বে।

কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কি হবে? কোথায় যেতে হবে?

পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহু আহু আহু, উতারো, উতারো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর। হোই...হা হা...

উ-র্‌-র্‌-র্‌—আ... উ-র্‌-র্‌-র্‌-আ...

মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিল্‌ হিল্‌ করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পেছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সেই গাভিন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটেছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না!

যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা!

কিন্তু মেয়েটি হুতাশে পেছন তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায় হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে ছুটতে যাবে পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট্‌ মত্‌।

কাদা মেখে প্রায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সঙ্গে। পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম সুর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, উররর-আ, আ-হুই! আ-হুই!

শুয়োরীটা অনেক দূর গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শুয়োরীটা দেখছে, খাচ্ছে আর চেচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেচাতেই পিল্‌পিল্‌ করে ছুটে এল দলের মধ্যে। কিন্তু চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!

মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব

কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হঁ হঁ! কোনো ডর নাই। হঁ হঁ। আ-হুই! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী! যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্‌ করে কি সব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদের দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস? আসবি? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি।···এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি রহস্য আছে সেখানে। কি ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরি-শৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়োখেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ! দুটো মানুষ! হাই বাপ্‌! জানোয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই। হেই মায়ী! দুদিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোনো দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মতো কল্‌কল্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলি সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর

দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে যেন ওরা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোয়ারগুলির গায়ে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ্, জলদি।

তখনো বুকজল। দুজনে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কিসব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ার-গুলির সামনে। উনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার

জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে। মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না কোনোমতে। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা—ই! হা--ই! পেছন থেকে মেয়েটি হুম্‌হুম্‌ শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবিনে।

শুয়োরগুলি তখনো ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। এখনো বোধ হয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শঙ্কায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অ্যাঁ? মরতে হবে? কি চায় এরা!

ওপারে নিয়ে যেতে চায়।

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরো উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক্। জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিস্‌নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পাগুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে।

সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হু-হু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কি এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাব-ভঙ্গি ভালো নয়। মেঘ তাতে আরো জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনো সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা—! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে! কে তোকে কি করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কি হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর-পুবে। যাবে না, কিছুতেই আর যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি একমুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনো মানুষ চিনতে শেখেনি, বিশ্বাস আসেনি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানোয়ার। হাই—হাই!

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জনোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, হ্যাঁ? হারামজাদী!..

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরো বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। চালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্ করছে জলের মধ্যে। গোঁ গোঁ করে কিসব বলাবলি করছে।

জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে হত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনো মাঝামাঝিও আসা যায়নি। জলের ধাক্কার ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরাগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের পা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কল্‌কল্‌ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস? আয়, আরো আয়।

বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্‌ করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোনো দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলি বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূরে সরে যাচ্ছে কেবলি। হাতের আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই সকৃতি! আর পারছিনে। বিদায় দাও।...... বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদের বিয়েতে ছুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।

আকাশ আরো নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে

একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় ব্যাম করে শব্দ হল।

অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।

আঁ আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড় কাতলা মাছের মতো। ছপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার। কিছু ডর নেই, চল্। যত জল্‌দি পারিস্ চল্।

যা দু-একটা জেলে নৌকা ছিল আশেপাশে, তারা সব পার ঘেঁষছে।

যত পশ্চিম, ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায়? শিউমন্দির? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনো অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি োক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওরা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষদুটোর উপর। ওদের সরে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বারবার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়েছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল। বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কি করে? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো?

মেয়েটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানিনে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি?

এই যে!

না, ডোবেনি। পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে। বলল, কি, তখলিফ হচ্ছে?

তখলিফ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরো বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙ্গে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ারগুলিও!

মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের

আস্‌কে পিটের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায়—

চিক্‌চিক্ ত্বাম! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেড়িয়ে পড়ল।

পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস?

হাঁ। আছি।

আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, উনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না?

হ্যাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, তুলে তুলে যেন হেসে উঠেছে ওদের কথায়।

আবার: আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায়?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ! মন্দিরের কাছাকাছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে উনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তেই সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণ। ঘূর্ণি।

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই।

উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ! হেই মায়ী।

আবার জোর ফিরে এল তুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার।

সে ঘূর্ণি কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমূহূর্তেই মনে হল, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায়।

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষ পর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে

লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস্ তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভালো করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল ফস্‌কে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটি মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেকদূর দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরো জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ্, চুপ্, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কী হ—ল ?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘনঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে! আর শুয়োরগুলি ভেসেই যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিসফিস্ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া। আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ায় দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে

হ্যাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারেনি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো! কাঁদিস্ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারো অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুন্‌গুন্ করতে লাগল।

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হই রামো!

তার তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।

জ্বালা

বংশী যখন গাঁয়ের দলবল সহ এসে পৌঁছল, তখন বেলা ঢলে গিয়েছে।

যদিও ফাল্গুন মাস, বাতাসটা পশ্চিমা। নিচু বাংলার দক্ষিণা বাতাস উত্তরের এই উঁচু তল্লাটে এসে আসর জমাতে পারে না। শুকনো ঝ'ড়ো পশ্চিমা বাতাস। হিমালয়ের জমাট কঠিন বরফ-চাটা এই ঝ'ড়ো বাতাসে হিমের ছোঁয়া আছে।

আকাশ ধুলোয় ভরে গিয়েছে। এক একটা ঝটকা আসছে বাতাসের। আর ধোঁয়ার মত ধুলো উড়ছে। গাছের পাতাগুলি ধুলোবর্ণ। মুখে-খড়ি-মাখা সং-এর মত। মানুষেরা তার চেয়েও বেশী। সারা গা, মাথা। চোখের পাতা আর ভুরু ধুলোমাখামাখি।

কাতার দেওয়া গরু আর ঘোড়ার গাড়িগুলি, জেলা পুলিসের জীপ আর ট্রাক, ভাড়াটে কয়েকটা মোটরগাড়ি, সবই ধুলোয় নেয়ে উঠেছে।

মেলাটা এইখানেই বসে। কয়েক শ বছর ধরেই নাকি বসে আসছে এই গ্রাম ও লোকালয়-ছাড়া দূর ধু-ধু অঞ্চলে। সবচেয়ে কাছের গ্রামটা তিন মাইল মাঠ পেরিয়ে। কোনও এককালে নাকি একটি নদী বইত। এখন সরে গিয়েছে পঁচিশ মাইল, একেবারে বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বিহারে।

জায়গাটা উঁচু-নিচু। মাঝে মাঝে গড়ের মত ঢিবি। কাঁকর আর বালি-মাটি। লাল ও ধূসর জমির কোথাও কোথাও কোমর-ডোবা জঙ্গল। বেঁটে ঝাড়ালো বট, পাতা ঝরা ন্যাড়া-ন্যাড়া। দলা পাকানো সাপের মত শিকড়। ঝুড়ি নেমেছে রাশি রাশি। বুড়ো আমগাছ কিছু। নয়া-কাঁসা-রং মুকুল ধরেছে অনেক বুড়ো গাছে। এখানে সেখানে কয়েকটা শিমুল আর পলাশে আগুনের রং।

যেখানটায় গাছগুলি বেশী ঘন, সেখানে শিব-মন্দিরটা আছে। সংলগ্ন আরও দু-একটি ছোটখাটো মন্দির। এগুলি শিবসঙ্গিনীদের। উঁচু নয়, মন্দিরগুলির বিস্তারই বেশী। বোঝা যায়, আকাশ-ছোঁয়া মন্দির করে প্রতিষ্ঠাতা দূরের মানুষকে হাতছানি দিতে চায়নি।

মন্দিরের পলেস্তারা খসে গিয়েছে অনেক দিন। ফাটলের হাঁ-মুখ সর্বত্র। চোখ পড়লেই মনে হয়, ফাটলে ফাটলে কাদের জিভ লকলক করছে। সেটাও মিথ্যেও নয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে সাপুড়েরা এ-অঞ্চলে আসে দল বেঁধে। ঝাঁপি ভরে নিয়ে যায় ঝুড়ি-ভর্তি পাঁকাল মাছের মত। শ্যাওলা, ঘাস আর লতাপাতায় মন্দিরের সর্বাঙ্গে অরণ্যসাজ।

কালো কষ্টিপাথরের মানুষ-সমান শিবলিঙ্গ আছে মন্দিরে। লিঙ্গের উপরে তিনটি বড় বড় চোখ আঁকা হয়েছে লাল রং দিয়ে। তাতে কালো মণি। আজকের এই শিব-চতুর্দশীর উৎসব উপলক্ষে, চোখ তিনটি আঁকা হয়। এই আরক্ত চোখ তিনটির শিল্পী বোধহয় পূজারী নিজেই। যে-লোকটা জটাজুট নিয়ে বারো মাস এখানেই থাকে।

দুটি চোখ বিশেষ করে অদ্ভুত জীবন্ত। অপলক আরক্ত চোখ দুটিতে দৃষ্টি কঠিন ও ভয়ঙ্কর। অন্তর্ভেদী সেই দৃষ্টির কাছে সব কিছুই যেন ধরা পড়ে যায়। মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। সভয়ে মাথা নোয়ায়।

এই দূর নির্জন অরণ্যে, লোকেরা আসে শিবরাত্রি উপলক্ষে। হাজারে হাজারে আসে। সাত দিন ধরে মেলা হয়। নাগরদোলা কিংবা সার্কাস, কিছু বাদ যায় না। মনোহারী কিংবা খাবারের দোকান গাদাগাদি সারি সারি। আদিবাসী আর বাঙালী কৃষি-জীবীদেরই ভিড় বেশী।

সাতদিন। তারপর আবার যে-কে-সেই। ভাঙা হাঁড়ি-চুড়ি ন্যাকড়া আর অগুনতি উনুনের কালো গর্ত মেলার স্মৃতি নিয়ে থেকে যায়। পূজারী আর শেয়ালেরা তাদের হৃত রাজ্য পায় ফিরে।

সাপ আর গিরগিটিরা তাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে ফিরে পায় নিরাপত্তা।

আজকের রাত্রিটাই সবচেয়ে সাধের রাত্রি। পুণ্য ও পাপক্ষয়ের জেগে থাকার রাত্রি। বিশেষ এই 'বাবা লোচনেশ্বরের' থানে। শিবের নাম লোচনেশ্বর। চোখেই যাঁর ভয়ঙ্কর ও বরাভয়ের লীলা।

পুণ্যের রাত্রি, কিন্তু ভয়েরও রাত্রি এই দূর অরণ্যের লোচনেশ্বরের থানে। তাই জেলা-সদর থেকে পুলিসকে আসতেই হয়। তীক্ষ্ণ নজর রেখে ফিরতে হয় চারদিকে। কারণ 'কথিত' কিংবা 'প্রবাদ' নয়; এইখানে এই মেলায়, এই রাত্রে একজন করে খুন হয়ে আসছে শুরু থেকে। রোগ কিংবা দৈব দুর্যোগে মৃত্যু নয়। খুন। আততায়ী কখনও কোনদিন ধরা পড়েনি।

মন্দিরের মধ্যে নয়, খুনটা হয় মেলার কোন ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে, গাছতলায়, টিবির আড়ালে, কুয়োর পাড়ে। নানান জায়গায়! কিন্তু লোচনেশ্বরের চৌহদ্দির মধ্যেই কোথাও ছুরি মেরে, গলা টিপে, মাটিতে মুখ চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে রেখে যায়।

কোন কোন বছর যে বাদ না গিয়েছে তা নয়। কিন্তু লোকেরা জানে, সেটা সুযোগের অভাবে নয়। হত্যা যার কপালে লেখা ছিল, লোচনেশ্বরের সীমানায় তাকে ঠিক সময়মত পাওয়া যায়নি নিশ্চয়। রক্তপায়ী চির-অদৃশ্য হাত দুটি খুঁজে পায়নি সেই নির্ধারিত বলিকে। কিংবা বাদ-যাওয়া বছরগুলিতে মরণ-চিহ্নিত সেই মানুষটির আবির্ভাব হয়নি মেলায়। কারণ, তখনও নিশ্চয় তার সময় পূর্ণ হয়নি।

তাই এই জেগে থাকার পুণ্যরাত্রে, বাবা লোচনেশ্বরের ডাকে যেমন সবাই না এসে পারে না, তেমনি ভয়টা প্রতিমুহূর্তে সবাইকে আড়ষ্ট করে রাখে। কার কপালে লেখা আছে? কখন শোনা যাবে সেই খবর! কখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে গোটা মেলাটা?

আর-সকলের মত বংশীও সেই কথাটা ভাবছিল। আর-সকলের চেয়ে একটু বেশী করেই ভাবছিল। তাই তার ফাটা মোটা কালো ঠোঁটের কোণ দুটি শক্ত হয়ে কুঁচকে আছে। তাই মেলার সীমানায় এসে পা দিতেই, তার দুই চোখ অনুসন্ধিৎসায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

দলের মধ্যে তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল শুধু ভুমরি। সখারামের যুবতী বিধবা। যার দিক থেকে বংশী একবারও চোখ ফেরায়নি সারাটি পথ। ছাতিফাটা তৃষ্ণায়, সামনে জল দেখেও বুঝি মানুষ এমন লোভী বংশীর মত তাকায় না মেয়েমানুষের দিকে। ও কী ছিরি তাকাবার? হলই বা লোক-জানাজানি। না হয় কড়ে-রাঁড়ী ভুমরি বংশীর দেওয়া ময়ুর-ছাপা শাড়ি পরে এসেছে সকলের টাটানো চোখের সামনে, গলায় পরে এসেছে রূপোর বিছে হার। এই শাড়ি আর হারগাছটি সবাই চেনে। বংশীর বউ বেঁচে থাকতে সবাই তার গায়ে দেখেছে এগুলি। তারপর উঠেছে বিধবা ভুমরির গায়ে। জানে সবাই। বুঝেছে সখারামের বিধবার পিছনে ঘোরা সার্থক হয়েছে বংশীর। ভুমরি মরেছে। সখারামের ভিটের আশেপাশে রাতবিরেতে যে-ছায়াটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত, তাকে চেনা গিয়েছে। ছায়াটা সখারামের নয়, বংশীর। এখন বাকী শুধু পঞ্চায়েত বসার, আর একটি ভোজের।

সবই ঠিক। ভুমরি মেয়েমানুষ। লোকজনের সামনে অমন হ্যাংলার মত তাকালে মেয়েমানুষের লজ্জা করে না? বংশীর হাবভাব দেখে, সকলের চোখ তার উপর এসেই যে পড়ে। লুকোবার জায়গা কোথায় পথে-ঘাটে!

কিন্তু বাবা লোচনেশ্বরের সীমানায় পা দিয়েই বংশীর এমন ভাবান্তর কেন? ভুমরির দিকে তাকাতেও ভুলে গেল যে?

কারণ আছে। কারণ আছে, তাই বংশীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু ছোট ছোট চোখ দুটি জ্বল-জ্বল করছে। আর কোঁচকানো ঠোঁটের আশেপাশে অস্পষ্ট হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। আজকে রাত্রে যে-খুনটা হবে, সেই কথা ভাবছে সে।

বংশী এতক্ষণে মাথা পর্যন্ত-ঢাকা-দেওয়া কম্বলটা খুলল। আর এক রাশ ধুলো ঝরে পড়ল কম্বল থেকে। খোঁচা খোঁচা চুলগুলি তবু ধুলো থেকে বাঁচানো যায়নি। কম্বল ভেদ করে সারা মাথা রং হয়ে গিয়েছে। ভুরু আর চোখের পাতা সাদা হয়ে গিয়েছে ধুলোয়। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়িতে কদম ফুলের রেণুর মত ধুলো। আট-হাতী মিলের ধুতিটি তুলতে তুলতে ঠেকেছে গিয়ে কুচকির কাছে। পাছার অনেকখানিও উদম। নিম্নাঙ্গের একটুখানি ছাড়া সবটাই প্রায় উলঙ্গ আর ধূলিময়। উর্ধ্বাঙ্গে অবশ্য ধূলিধূসর জামাটির গলার বোতাম পর্যন্ত বন্ধ আছে।

সকলের সঙ্গে বংশী এসে দাঁড়াল লোচনেশ্বরের মন্দিরের সামনে। পশ্চিমা শুকনো ঝ'ড়ো বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে মন্দিরের নোনা ইটের গায়ে। আশপাশের গাছগুলি মাথা ঠোকাঠুকি করছে পরস্পরের। চরদিকে শুকনো পাতা উড়ছে সরসরিয়ে।

বাতাসটা স্বাভাবিক নয়। একটা কিছু যেন ঘটাবার তালে আছে। একটা ভয়ঙ্কর কিছু। মন্দিরটাকে উপড়ে ফেলা কিংবা গাছগুলিকে দুমড়ে ফেলার মতলব আছে বোধ হয়। চাপা শাসানি আর মাঝে মাঝে ডাকছাড়া গর্জনের মত গর-গর শব্দ উঠে আসছে দূর মাঠ থেকে।

আকাশটা এই মার বাঁচিয়ে আরও উঁচুতে উঠে যেতে চাইছে যেন। পারছে না, আরও রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। নীচে নেমে আসছে আরও বাতাসের থাবায়।

সকলেই চিৎকার করে কথা বলছে। আস্তে কথা শোনা যায় না। ঠোঁটের ডগার শব্দ বেরুতে না বেরুতেই উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাসে।

লোচনেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বংশীর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। ধুলোর ঝাপটা খাওয়া লাল চোখ দুটি তার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল আরও। দড়ির মত মোটা গলার শির কাঁপতে লাগল তার। তার কী যেন হল।

সে চাপা গলায় বলল, চায়া রইছে।

বুড়ো অজন মণ্ডলের কানে কথাটা গিয়েছে। সে বংশীর দিকে তাকাল। আর একবার লোচনেশ্বরের দিকে। মন্দিরের গহ্বরের অন্ধকারে গায়ে গা মিশিয়ে রয়েছে কষ্টিপাথরের লোচনেশ্বর। দপদপ করছে শুধু শাদা ফাঁদের লাল চোখ।

বংশীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল অজন, হেই, হেই বংশী, কী কইছিস রে?

মোটা চাপা স্বরে বলল বংশী, চায়া রইছে।

চায়া রইছে?

হ। লচনেশ্বর চায়া রইছে না আমার দিকে?

অজনের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে রেগে উঠে ধমক দিল সে, হা রে ধূর মর্। চখ লামা, নমঃ কর। সকলকার দিগে চায়া রইছেন উনি। ওর একলার দিগে নিকি খালি? নমঃ কর।

উপুড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল বংশী। কিন্তু তারপরেও সে তেমনি তাকিয়ে রইল। আর একটি রহস্যময় হাসি তার ধুলো মাখা গোঁপ-দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠতে লাগল।

ভয়ে ভুমরির রাগ হতে লাগল বংশীর দিকে তাকিয়ে। অভিমানে কাঁপতে লাগল নাকছাবি। কেন, ওরকম করছে কেন লোকটা?

বংশী বলল ফিসফিস করে, সব দেখতেছে হে অজন খুড়ো। সব দেখবার পারতেছে বাবা লচনেশ্বর।

দেখবার পারতেছে?

হ। বাবা দেখবার পারতেছে, কে খুন হবা। কে করবা।

আরে ধূর, মর গাধা, চখ লামা। বাহারা চল্।

বেশী ভয়ে গলা বেশী চড়ল অজন বুড়োর।

কিন্তু বংশী আবার বলল, আর আমার য্যান্ কী হয়া গেল হে খুড়ো।

অজন ভয়ে প্রশ্ন করতে পারল না। একটা বাতাসের ঝাপটা তার বুড়ো ঠোঁট তুটিকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলে শুধু। বাকী সঙ্গীরা ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ছিল।

বংশী বলল, আমার আশা ফলবা। আমি দেখবার পাবা, মন কইছে।

অজন আরও জোরে ধমকে উঠল, গাধাটা। চল্ লায়মা চল্। আস হে সব, বসবার য়্যাট্‌টা জায়গা বিচরায়া নিবা লাগবে।

সবাই প্রায় সরে গেল বংশীর কাছ থেকে। এই সুযোগটাই খুঁজছিল ভুমরি। একেবারে বংশীর গায়ের উপর এসে পড়ল। ভয়ের চেয়ে রাগটাই তার বড় বড় চোখের ফাঁদে ঝিকিয়ে মিকিয়ে উঠল। বলল, কী হইছে, অ্যাঁ? কী দেখবার পাবা তুমি, অ্যাঁ?

বংশী হেসে বলল, ভয় করিস নাগো ভুমরি।

ভুমরি সে-কথা না শুনে বলল, কী দেখবার পাবা তুমি, সেইটা ক্যান্ কওনা?

বংশী হাসল, কিন্তু চোখ তুটি বড় বড় হয়ে উঠল তার। গলার স্বরটা মোটা শোনাল। বলল, খুনটা?

খুনটা?

হা খুনটা। যে-খুনটা হবা আইজ রাইতে।

ভুমরি শিউরে উঠে বলল, ক্যান, তুমি ক্যান দেখবার পাবা? তুমি কি পুলিস নিকি? চুপচুপা পুলিস তুমি?

ই ছ্যাখ। ইতে পুলিসে কী করবা। পুলিসের বাবা দেখপার পাবা না। চুপচুপা পুলিসের বাবাখানও দেখবার পাবা না।

চুপচুপা পুলিস সম্ভবত গোয়েন্দা পুলিস। ভুমরি বলল, তয় তুমি দেখবার পাবা ক্যান?

আমার মন কইছে। য়্যাট্‌টা আশা লইয়া আইসেছি না আমি? তয়, আমি নমঃ করলাম। মনে হইল, আমি দেখবার পাবা।

অজন চিৎকার করে উঠল মন্দিরের দাওয়ার নীচ থেকে, হেই বংশী, আয়। আয়া পড়।

পা বাড়াল বংশী। বলল আয়। আয়া পড় ভুমরি।

ভুমরি এল। তবু না জিজ্ঞেস করে পারলে না, তুমি মান্‌ষু কি দেবতা? দেবতা দেখবার পায়। তুমি দেখবার পাবা ক্যান্?

মন কইছে।

মন কইছে। এর বেশী কিছু বলার নেই বংশীর। কারণ খুনটা সে নিজের চোখে দেখতে চায়, এইটি মনে করে এসেছে। বাবা লোচনেশ্বরের কাছে এসে, তার যেন কী হল। তার মন বলছে, সে দেখতে পাবে।

ভুমরি আর কিছু বলতে পারল না সকলের সামনে। তার সহবত ও লজ্জা আর আর দশটি বউয়ের চেয়ে বেশী হবারই কথা। সমাজের রীতি ভেঙে বিধবা হয়ে সে একজন পরপুরুষের সঙ্গে খারাপ হয়েছে কিনা, তাই। তাই তার ঘোমটা বেশী, রা কম। ভুমরিদের দেশে, ভুমরির মত মেয়েরা এরকমই করে। যাতে কেউ খুঁত কাড়তে না পারে।

খারাপ হয়েছে বটে ভুমরি। তবু একটা মানুষের ভাল-মন্দের কথা ভেবে মনটা আঁকুপাকু করে যে?

মন্দির থেকে খানিকটা দূরেই, গাছতলায় জায়গা বাছা হল। মেয়েরা শতরঞ্চি পাতল। বোচকা-বুচকি খুলে বসল সবাই। যদিও শতরঞ্চি না পাতলে ক্ষতি ছিল না। কারণ পাততে না পাততেই শতরঞ্চি ধুলো হয়ে গেল। যারা বসবে, তাদের গায়ের ধুলোও কম নয়।

রান্না খাওয়ার পাট নেই, সকলেই নির্জলা উপবাস। বসে বসে রাতটা জাগতে হবে লোচনেশ্বরের থানে, সেই পুণ্যের জন্যেই আসা। কাল ভোরে, বেল গাছে ঝাঁকনি দিয়ে, সরোবরে নেয়ে, হাঁড়ি চড়ান হবে।

পুরুষদের বোচকা থেকে বেরুল হুঁকো-কলকে আর তেলচিটে তাস। মেয়েদেরও হুঁকো আছে। একটু নলচে আড়ালে অবশ্য গোলোকধাম আর কড়ি এসেছে তাদের।

মেয়েরা তাদের দলে নিয়েছে ভুমরিকে। কারণ পুরুষেরা বংশীকে নিয়েছে। ছাব্বিশ বিঘা জমি আছে বংশীর। ছেলে বিয়োবার আগে বউটা মরে গেল লোকটার। যোয়ান বয়সে বউ নিয়ে ঘর করতে করতে বউ মরে গেলে পুরুষ থাকতে পারে না। মন আকুপাকু করে। মহকুমা শহরে গেলে বংশী বাজারের বউগুলোদের কাছে যেত। তার ছাব্বিশ বিঘা জমি আছে একলার। লোকটা ছোটখাট নয়। শাওনে আগানে অনেকগুলান মুনিষের মজুরি নিলে তার কাছে। পঞ্চায়েতেরও একটা হেড বংশী। বাজারে যেতে যেতে, সখারামের বিধবাকে চোখে লাগল তার। তারপর একদিন রাতে গিয়ে বিধবাকে খারাপ করে এল।

বিধবাটাও অবশ্য কবুল খেয়েছে! বলেছে, ভয়ে সে দরজা খুলে দিয়েছিল। কারণ সে ভেবেছিল, সখারামেরই আত্মা এসেছে তার কাছে।

গাঁয়ের মেয়েরা একেবারে অবিশ্বাস করেনি ভুমরিকে। কারণ যুবতী বউ রেখে গেলে মরা সোয়ামীরা রাত-বিরেতে সত্যি বড় জ্বালায়। তারপর যখন চিনতে পারল বংশীকে, তখন আর কোন চাড়া নেই।

ছাব্বিশ বিঘা জমি আছে লোকটার। লোকটার ভার আছে।

অজন অবশ্য বলেছিল বংশীকে, একটা পাপ হবার লাগছে হে বংশী।

বংশী বলেছিল, ক্যান্?

সখারামের ঘরে য়্যাট্টা লোক যাওয়া-আসা করবা লাগছে।

একটু ভেবে বলেছিল বংশী, হ, লাগছে। য়্যাট্টা পঞ্চাৎ ডাকবা লাগে তয়?

অজন অবাক হয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে বলেছিল, হ, লাগে তয়।

কবে ডাক করবা?

অজন অবাক হয়ে বলেছিল, লোকটারে চিনবার লাগে আগে।

বংশী বলেছিল, আমি চিনি। কবুল খাবা লাগবে তার। পঞ্চাতের হুকুম মানবা লাগবে। হ।

বোঝা গেল, বংশী কবুল খেতে চায়। পঞ্চায়েতের শাসনও মানতে চায়। শাস্তি নিতে চায়। অতএব ধীরে সুস্থে পঞ্চায়েত বসালেই হবে। না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনার বাইরে।

তবে মেয়েরা আজ বলতে ছাড়েনি, বংশীর বউকে এই ময়ূরছাপা শাড়িটা পরলে মানাত। হারটা যে বংশীর বউয়ের সেটাও তারা ঠারে-ঠোরে না শুনিয়ে পারেনি। ছাব্বিশ বিঘেওয়ালা, উঠোনে ডালিম গাছওয়ালা বড় একখানি ঘর, দুটো বলদ, একটা গাই, একটি গোয়ালের মালিক বংশী ভুমরিকে গুন করেছে, এই জ্বালাটা মেয়েদের বুকে আছে। তবু তারা দলে নিয়েছে ভুমরিকে। কারণ বংশী আর ভুমরি, কিছুতেই ছাড়াছাড়ি করবে না।

মেয়েরা বসল একদিকে। পুরুষেরা আর একদিকে। গোটা দুই হ্যারিকেনও বেরিয়েছে। কিন্তু বাতাসের তাণ্ডবে জ্বালানো চলবে কিনা, সন্দেহ।

আশেপাশে এরকম অনেক দলই বসেছে। ছেলেপুলের ভিড়ও কিছু কম নয়। দোকানপাটগুলি একটু দূরে। সেখানে ব্যাটারি-সেট লাউডস্পীকারের গান চলছে। ভেঁপু বাজছে প্যাঁ পোঁ। বাতাসের ঝাপটা শব্দগুলিকে যেন দ্বিগুণ করে তুলছে।

আবার সেই কথা বংশীর। বলল, কবা নি পার হে অজন খুড়ো, কে মরে?

এখন আর তত অস্বস্তি নেই অজন বুড়োর। বলল, ফির কে? পাপী না?

পাপী?

হ।

দলের মেয়েপুরুষের সকলেই পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি

করল। পাপী মরে? কী রকম পাপী? কোন্ পাপ করলে এখানে মরতে হয়?

সবচেয়ে বুড়ো অজনের লোল চামড়া ঝুলে পড়ে। চোখ অন্ধ হয়ে যায়। হাঁপিয়ে-পড়া কুকুরের মত ঝুলে পড়ে জিভটা।

দলের একজন বলল, হ, ইখানকার মন্দিলের সাধুবাবা কইছিল গেল সোন, য়্যাটটা পাপীরে মারেন লচনেশ্বর, জানবা হে ব্যাটা।

বংশী এসব চিন্তার ধার দিয়েই গেল না। বলল, লচনেশ্বর নিজের হাতে মারে নিকি?

জানে কে বা?

বংশী বলল, আমার মন কয়, মানুতে মারে।

মানু?

হ,। লচনেশ্বর যার উপুরে ভর করে, সেই মানুর হাত দিয়া মারে।

সেইটা কেউ কবা পারে না।

বংশী বলল, আমার মন কবা লাগছে। আমি দেখবার পাবা।

অমনি ভুমরির ভুরু বেঁকে ওঠে, ওই ছাখ, আবার সেই কথা।

অজন বলল, চুপ কর বংশী।

হ, আমার মন কয়।

অজন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, চুপ কর।

চুপ করল বংশী। কিন্তু তার অপলক চোখের চাউনিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আরও। অনুসন্ধিৎসু চোখে সে চারদিকে তাকাতে লাগল অবিশ্বাস ও সন্দেহে।

তুরুপ খেলায় জন্য তাসও ভাঁজা আরম্ভ হল। গোলোকধাম খুলল মেয়েরা। বাতাসটা থামবে না। মানুষকে স্থির হতে দেবে না একটু। একটা প্রলয় ঘটাবার জিদ্ আছে তার ঝাপটায়।

রক্তাকাশে কালো ছোপ লাগছে। এখানে ওখানে অন্ধকার জমছে। মাঝে মাঝে হ্রেষাধ্বনি করছে ঘোড়া।

মানুষ এখনও আসছে। সারারাত ধরে আসবে।

বংশী উঠে পড়ল। আগে চোখে পড়ল ভুমরির। কিন্তু সকলের সামনে সে কিছু বলতে পারল না। কেবল তার কড়ি চাল চালতে ভুল হয়ে গেল।

অজন জিজ্ঞেস করল, কুনঠে যাস বংশী।

বংশী বলল, টুকুস্ ইদিক ওদিক দেখবা মনে করে। ঘুর‍্যা আসি।

অজন না খেললেও তখন তার তাসে মন। বলল, ফুড়ুত করৢা আসিস রে।

হ।

ধুলোমাখা কম্বলটা সারা গায়ে জড়িয়ে নিল বংশী। কাপড়টা তেমনি নেংটির মতই তোলা। রক্তাভ চোখ দুটি তার চকচক করছে। তার মনে হল, কে যেন তাকে উত্তরের কোমর-ডোবা জঙ্গলের দিকে টানছে। যে-দিকটায় জঙ্গল সাফ করে, বাতি জ্বালিয়ে বসেছে অনেকেই। সে যেন লোকের মধ্যে, এত কলরবের মধ্যে পা টিপে টিপে চলছে। কারণ সে দেখবা পাবা। দেখতে চায় সে।

কেবল ভুমরির চাল চালা হল না। মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠে তার হাত থেকে কড়ি ছিনিয়ে নিয়ে বলল, ভাতার থেক্যা ইয়ের টান বেশী।

ভুমরির টেপা ঠোঁটের আড়ালে কান্না ও অভিমানের ডাকটা মাথা কুটতে লাগল।

ই লোকটা নি হবা পারে? বংশী মনে মনে ভাবল, মাদুর বিছিয়ে বসে থাকা একলা একটি লোককে দেখে। যার সঙ্গে বাতি নেই। মুখটা অন্ধকারে ঢাকা।

না। নিজের মনের মধ্যেই কে যেন বলে উঠল তার। সে এগুতে লাগল।

কোমর-ডোবা আসশেওড়ার জঙ্গল বাতাসে মাথা কুটছে মাটিতে। শব্দ উঠছে ক্রুদ্ধ সাঁ-সাঁ স্বরে। একদিনের মধ্যেই মানুষ পথ করে নিয়েছে এই জঙ্গলে। চতুর্দশীর অন্ধকারে, এখানে টিমটিমে বাতি। অন্ধকার তাতে একটি জীবন্ত রহস্যময় রূপ

পেয়েছে। মানুষগুলিকে দেখাচ্ছে ছায়ার মত। কেউ কেউ মাদুর পাটি চাদর দিয়ে মাথায় ছাউনি করে নিয়েছে এর মধ্যেই। পথ চলতে লোকের ভিড়। বংশী ধাক্কা খাচ্ছে বারে বারে।

কয়েকটা লোক তাস খেলছে এক জায়গায়। শুধু একজন অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে একজনের পিছনে। কেন? হাতে কী ওটা লোকটার?

বংশীও চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে শুধু দেখবে। সে কিছুই বলবে না। কারণ বলা নিষেধ। বাবা লচনেশ্বরের ক্ষুধা। জানিবা পাবা, বলবা না।

লোকটা নড়ছে না। একদৃষ্টে তাসের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু হাতে কী আছে লোকটার? সাপ নাকি? সাপের ছোবল দিয়ে মারবে?

লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। হাতে কিছুই নেই। দু হাত মুঠো করে রেখেছিল খেলা দেখার উত্তেজনায়। বলল, ই হবা লাগবে, জানতাম। বিজার হার হয়্যা গেছে।

বংশী এগুল। কে হবা পারে? কে মরবে? মারবে কে?

দক্ষিণ দিকটা ঘুরতে ঘুরতে, পুবে পাক খেল বংশী। কী জানি, ওদিক হয়ত এতক্ষণে সাবাড় হয়ে গেল কেউ। কিন্তু মন বলছে বংশীর, সে দেখতে পাবে। সে ত নিজে বাঁক নেয়নি। কে যেন তাকে পুব দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। আর খুন হলে এতক্ষণে সোরগোল পড়ে যেত।

না, ভয় পেলে চলবে না। ভয় তার করছেও না। কারণ নির্ঘাত আবিষ্কার তার কপালে লেখা রয়েছে। সে অনুভব করছে, ইচ্ছে না করলেও তাকে ঠিক জায়গায় টেনে নিয়ে যাবে। এখন আর সে নিজের ইচ্ছাধীন নয়।

এদিকটায় একটু অন্ধকার বেশী। যদিও অদূরেই আলো দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছি অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছে লোকজনের। এদিকের জঙ্গলটা আরও গভীর। সরোবরের কাছাকাছি জায়গা এটা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বংশী। চাপা ফিসফিস কথা শোনা যাচ্ছে কাছেই। কে যেন কাকে ডাকছে, আয়, আয় কবা লাগছি। তারপরেই, কান্না-কান্না গলা একটা, না না।

মেয়েমানুষের গলা। কাঁচের চুড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোথায়? কোনদিকে।

আবার মেয়েমানুষের গলার চাপা আর্তনাদ, উঃ, উঃ।

পরমুহূর্তেই বংশীর চোখে পড়ল অস্পষ্ট মূর্তি দুটি। আলোর সামান্য একটু রেশ পড়েছে দুজনের গায়ে। মেয়েমানুষটির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুরুষটা। সরোবরের দিকে টানছে।

পলকে ভেসে উঠল বংশীর চোখের সামনে, পাঁচ বছর আগের খুনটা। একটি মেয়েমানুষের গলা টিপে মেরে ফেলে দিয়েছিল জঙ্গলে।

নিশ্বাস বন্ধ করে, হাত-পা শক্ত করে, জঙ্গলের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রইল বংশী। টানছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েমানুষটিকে। বংশীও নিঃসাড়ে অনুসরণ করল।

ঠিক একটা বুনো শুয়োরের মত, জঙ্গল মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এত কাছে যে, বংশী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ওরা দেখতে পাচ্ছে না!

মেয়েমানুষটি আর কিছু বলছে না। যেন সব আশা ছেড়ে দিয়ে মড়ার মত চলেছে। হঠাৎ দাঁড়াল দুজনে। বংশীও দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে রইল সে। কী দেখতে হবে? হে বাবা লোচনেশ্বর, কী দেখতে হবে এবার।

সহসা কী একটা শব্দ শুনে, বংশী যেন অবশ হয়ে গেল। শব্দটা আবার হল। আবার, আবার, বারে বারে। লোকটা চুমো খাচ্ছে যে? আর তারপরেই স্পষ্ট দেখল বংশী, দুজনেই আদুল-গা। পরিষ্কার শুনতে পেল যেন, কান্নার ছলনায় মেয়েমানুষটি হাসছে! আর আলিঙ্গন-অবস্থায় মাটিতে মিশছে দুজনেই।

কিছুক্ষণ অবশ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল বংশী। খুন না, উল্টো। ভুমরির কথা মনে পড়ছে তার। যার কথা সে ভাবতে চায়নি

একবারও। লোচনেশ্বরের থানে এসে ভাবতে চায়নি। দেখতে চায়নি ফিরে!

ভুল হয়েছে। পা টিপে টিপে সরে গেল বংশী। পুব দিকের লোকালয়ে এগুল।

ও কিছু নয়। এরকম ধোঁকা খেতে হবে। দেখতে হবে লোচনেশ্বরের ছলনা।

আবার লোক। মেয়ে আর পুরুষ। ছায়া ছায়া দলা দলা। অন্ধকারটা কাঁপছে টিমটিমে আলোয়। বাতাস শাসাচ্ছে সর্বক্ষণ। আকাশে কিন্তু স্থির জোনাকির মত তারারা হাসছে মিটমিট করে।

কে হবা পারে?

নজরে পড়ল, এক জায়গায় ভিড় আর গোলমাল। পুলিসও দেখা যাচ্ছে। হয়ে গেল নাকি সাবাড়? প্রায় ছুট দিল বংশী। ছুটতে ছুটতে গেল। সে নিজে নয়, ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে কেউ!

না, খুন নয়। নাচ হচ্ছে। ব্যাটাছেলে মেয়েমানুষ সেজে নাচছে। চোখ ঘুরিয়ে হেসে হেসে নানান রঙ্গে ভঙ্গে নাচছে। সারা রাতই নাচবে খেলাভরে। লোককে জাগিয়ে রাখাও হবে, কিছু রোজগারও হবে। প্যালা পাওয়া যাবে। জেগে থাকবার মহৌষধ। দলের একজনের গলায় হারমোনিয়াম আর একজনের গলায় ঢোল। যে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, সে গান করছে।

না, এসব দেখবে না বংশী। লোক ভুলিয়ে রাখার ছলনা এসব, বাবা লোচনেশ্বরের পাপীর হত্যা অন্য জায়গায়। সে এগুল।

কে হবা পারে?

ঘোড়া, গরু, বাড়ি আর মানুষ থিক-থিক করছে। আর মনে হচ্ছে বংশীর, কী যেন একটা চেপে আসছে বাতাসে। মেলাটা যেন ছোট হয়ে আসছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কী একটা চেপে আসছে চারদিক থেকে। মনে হচ্ছে, সময় হয়ে আসছে। রক্তপায়ী অদৃশ্য হাতটা খুঁজে বেড়াচ্ছে নির্ধারিত বলিকে। সেই হাতটিও যেন বংশীর মতই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিকে দিকে।

পুব দিকটা শেষ হয়ে গেল। রাতও অনেকখানি হল যেন। বংশী দেখল, তার নিজের মুখ পশ্চিম দিকে। এতক্ষণ বাতাস তাকে ঠেলছিল। এখন তার হয়ে কেউ যেন বাতাস ঠেলছে। পশ্চিম দিকে যেন কে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বাতাসটা আরও ঠাণ্ডা। সন্থ সন্থ বরফ চেটে নেমে এসেছে। ছোবলাচ্ছে চোখে মুখে। এগুতে গিয়ে দূর থেকে নিজের দলটাকে দেখতে পেল বংশী। তাস খেলছে সবাই। মেয়েরা গোলকধাম চালছে।

কেবল ভুমরি গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে আছে উত্তর দিকে। ওই দিকে সে যেতে দেখেছিল বংশীকে।

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল বংশী। তার মনে হচ্ছে, ভুমরির দিকে এখন তার তাকাতে নেই। তাকে যেন কেউ শাসানো গলায় বারণ করছে। হেই বংশী, চাবা না। চাবা পাবা না অখন মেয়েলোকটার দিকে। চোখ বুঁজে চলে যাক সে।

বাতাসটা বড় কনকনে। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করছে।

এদিকটায় গাছ বেশী। বড় বড় গাছের আড়ালে চলে বংশী।

পশ্চিম দিকটায় দোকানপাট। কাছাকাছি হ্যাজাকের আলোয় চারদিক দিনের আলোর মত ফরসা। বেচা-কেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দলে দলে বসে সবাই গল্প করছে, না-হয় তাস খেলছে। খোল-করতাল বাজিয়ে গান করছে কোনও কোনও দল।

কে হবা পারে?

একটা লোক হামা দিয়ে এগুচ্ছে দোকানের পিছনের অন্ধকারে কেন? এগিয়ে গেল বংশী। পিছনে হাঁটুভর জঙ্গল। কালো কালো কুচকুচে অন্ধকার। কিন্তু লোকের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এগুল বংশী। লোকটা হামা দিয়ে চলছে তখনও।

ভিখারীর দল এদিকটায় টের পেল বংশী। হামা দেওয়া লোকটা বিকালাঙ্গ। ভিক্ষে শেষ করে দলে ফিরছে।

এগুল বংশী। পাহাড়ীদের আস্তানা। কেন এদের পাহাড়ী

বলে, কে জানে? কয়েক পুরুষ আগে হয়ত এরা পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল। এখন বংশীদের মতই। কথাও বংশীদের মতই বলে। শুধু তাড়ি খায় বেশী। আর পাহাড়নীরা যার তার সঙ্গে শোয়। তাই ওদের আস্তানার কাছে মেলাই লোকের ভিড়। সেপাইও তালে ঘুরছে।

এদিকটায়ও কোমর-ডোবা জঙ্গল। বাড়ি আছে দু-একটা।

হঠাৎ নজরে পড়ল বংশীর, তিন-চারজন লোক একজনকে ধরে কী করছে। উঁকি দিল বংশী। লোকটাকে জাপটে ধরেছে সবাই। লোকটা হুঙ্কার দিয়ে ছাড়বার চেষ্টা করছে।

কেন? এত লোক মিলে মারবে? হতে পারে। তিন-চারজনের উপর ভর করেছে হয়ত। মারছে ওরা লোকটাকে।

একজন শাসাচ্ছে, বান্, বাইন্দা ফালা শালারে।

ক্যান্? বংশী জিজ্ঞেস করল।

তাড়ি খায়া চেতন নাই। খারাপ কাম করবা চায়।

একজন হেসে বলল, পাঁঠা।

মিছামিছি ব্যাপার। নিজেদের লোককে শাস্তি দিচ্ছে। তাড়ি খেয়ে খেপে গিয়েছে, তাই।

তারপরে কয়েকটা নেপালীদের আস্তানা, কিছু কিছু ভুটিয়াও আছে। সেখানে রীতিমত জুয়ার আসর বসেছে। খেলার নাম জানে না বংশী। বাটির মধ্যে তিনটি ঘুঁটি নিয়ে, ঝাঁকিয়ে গদির উপর ফেলছে। ঘুঁটির নম্বরের উপর ভাগ্য ওলট-পালট হয়।

জুয়া বে-আইনী। লোচনেশ্বরের থানে আজকের রাতটা বে-আইনী নয়। কিন্তু এখানে যে-কোন মুহূর্তে মারামারি খুনোখুনি হতে পারে। বরাবরই হয়। তাই পুলিশের কড়া পাহারা এখানে। গোলমাল হলেই আসর ভেঙে দেওয়া হবে।

সাপের মত অপলক ছোট ছোট চোখ লোকগুলির। রাগলে বোঝা যায় না, হাসলে ধরা যায় না। কিন্তু চোখগুলি সকলেরই টকটকে লাল। জ্বলছে অঙ্গারের মত। সকলেই দাঁতে দাঁত

ঘষছে আর তাকাচ্ছে পরস্পরের দিকে। যেন খ্যাপা জানোয়ারেরা চেপে আছে নিজেদের। সুযোগ পেলেই টুঁটি টিপে ধরবে যেন। দূরন্ত বাতাসও এখান থেকে মদের গন্ধটা দূর করতে পারছে না।

বংশীর মনে হল, তার পা দুটি যেন কেউ টেনে ধরছে এখানে। এখানকার এই নীরব ভিড়ে। কে? কে হবা পারে ইখানে?

সহসা একজন উঠে দাঁড়াল আসর ছেড়ে। বোধহয় ভুটিয়া। কোমরে তার কুকরি।

লোকটা চোয়াল শক্ত করে, মুঠি পাকাচ্ছে ঘন ঘন। কয়েকজন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

হঠাৎ লোকটা লাথি দিয়ে ঘুঁটি চালবার বাটিটা ফেলে দিল।

ধক করে উঠল বংশীর বুকের মধ্যে এইবার। এইবার হে বাবা লোচনেশ্বর। ভর হয়েছে লোকটার।

লোকটা আবার উপুড় হয়ে, জুয়ার গদি-ঘরটাকে টান মেরে ছুঁড়ে দিল একদিকে। আর সেপাইটা ঠিক এসময়েই অন্য দিকে ঘুরছে। এইবার! এইবার!

লোকটা দুটো হাত কোমরের উপর রাখল। বাকী লোকগুলি হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে তখনও। যেন মন্ত্রমুগ্ধ। লোচনেশ্বরের মায়ায় ধরা পড়েছে লোকগুলি।

তারপর হঠাৎ লোকটা বসে পড়ল। বসে মুখটা গুঁজে দিল মাটিতে। আর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

ধূর মর! কাঁদবা লাগছে যে হে? আর বাকী লোকগুলি হাত বুলোচ্ছে তার গায়ে। সান্ত্বনা দিচ্ছে। লোকটা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। আসলে লোকটা দুঃখে ওরকম করছিল। রাগারাগি হলে, এতক্ষণে লেগে যেত।

না, এখানে নয়। পা দুটি মুক্তি পেয়েছে। আবার তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের শূন্য নির্জন অন্ধকার মাঠের দিকে। যেখানে বাতাসটা ডাক ছাড়ছে গরগর করে।

কিন্তু লোক দেখা যায় না। বাতাসটা যেন চাবুক কষছে

বংশীকে। মোটা কম্বলটা পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। শুধু ধুলো টের পাওয়া যাচ্ছে না। চোখে না দেখতে পেলে বোধহয় ধুলোয় চোখ বুঁজে যায় না।

কিন্তু লোক দেখা যায় না। জঙ্গলও নেই। ন্যাড়া ন্যাড়া ঢিবি শুধু দু-একটা ছড়ানো, বংশীর মনে হল, কে যেন তাকে থামিয়ে দিচ্ছে। বংশী দেখল, তার মুখ দক্ষিণ দিকে।

মাঠের উপর একটি সুদীর্ঘ পাক দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগুল বংশী। রাত কি শেষ হয়ে আসছে? মেলাটা ঝিমিয়ে আসছে যেন? কলের গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভেঁপুগুলি বাজছে না আর। আর বাতাসটা কি হঠাৎ পড়ে আসছে নাকি?

তবে কি এ-বছর বাদ? লোচনেশ্বরের ক্ষুধা নেই?

দক্ষিণ দিকটাও জঙ্গলশূন্য। একটি সুদীর্ঘ ঢালু পথ। ক্রমেই নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। আলো খুব সামান্যই দেখা যায়। দু-একটি। কিন্তু ছায়া ত দেখা যায় অনেকগুলি।

এক জায়গায় অনেকগুলি মেয়েমানুষ। খারাপ মেয়েমানুষ। পুরুষেরা যেন শুঁকে বেড়াচ্ছে মেয়েদের গায়ের কাছে গিয়ে।

হঠাৎ কী রকম শক্ত হয়ে উঠল বংশীর শরীর। দাঁতে দাঁত চেঁপে বসল। তার বুকের খাঁচাটার মধ্যে কে যেন চিৎকার করতে লাগল, খারাপ! খারাপ!

জায়গাটা সে তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল। কিন্তু তার সারা গায়ের মধ্যে কী একটা ছটফটিয়ে মরছে। চোখে উঠে আসছে রক্ত। কে যেন তাকে ঠেলে ঠেলে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নির্জন অন্ধকারে।

আর ঠিক এই মূহূর্তেই, পায়ে কী একটা ঠেকল। আবার ছলাত করে রক্ত উঠল মাথায়। সে নিচু হয়ে দেখল, কী একটা চকচক করছে। হাত দিল বংশী। নেপালী কুকরি একটা।

কম্বলটা পড়ে গেল বংশীর গা থেকে। সে দেখল, স্বয়ং বাবা লোচনেশ্বর তার হাতের পেশীতে কিলবিল করছে। আর তার সারা গায়ে অসুরের বল, পাশবিক হিংস্রতায় দপাদাপি করছে।

বংশী দেখল, হাতটা তার নয়। লোচনেশ্বরের থানের সেই অদৃশ্য রক্তপায়ী হাত দুটি তারই।

বাতাসটা একেবারে পড়ে গিয়েছে। আশ্চর্য স্তব্ধতা চারদিকে। দরদর করে ঘামছে বংশী। কে? কে খুন হবা পারে? কারে মারবা লাগবে? কে সে? কোথায়?

তীক্ষ্ম শ্বাপদ হিংস্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে মাটি কাঁপিয়ে সামনের ছায়াটা লক্ষ্য করে এগুল বংশী। ছায়াটা মানুষ নয়। একটা নিশিন্দা গাছ।

ছায়াটার কাছ থেকে সরে আসতেই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল বংশী। নিজের কুকরি-ধরা হাতটার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে তার চোখ বড় হয়ে উঠল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। প্রাণভয়ে সে চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না। কেবল তার কুকরি-ধরা হাতটা, শক্ত হয়ে তার নিজেরই বুকের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সে কাঁপতে কাঁপতে দেখল হাতটা তার নয়, সখারামের। ভুমরির স্বামী সখারাম, সে দেখল পাগীটা নড়তে পারছে না। আর রক্তপায়ী হাতটা স্থির নিষ্ঠুর ভাবে উদ্যত।

বংশী আপ্রাণ চেষ্টা করে, শেষবারের জন্য চিৎকার করে উঠল, ক্ষ্যামা দে ভাই সখারাম। বাঁচাও! সখারাম মাইরা ফেলাইল।

কিন্তু ততক্ষণে কুকরিটা আমূল বিদ্ধ হয়ে গিয়েছে বংশীর পাঁজরে।

লোক যখন জমল, তখন বংশীর রক্তাক্ত মৃত শরীরটা ধুলোয় লুটিয়ে রয়েছে। শুধু হাজার ভীত সন্ত্রস্ত লোকের মাঝে, লোচনেশ্বরের অলৌকিক লীলা দেখতে লাগল ভুমরি। কাঁদতেও সে ভুলে গিয়েছে। কারণ, আশপাশের লোকেরা বলেছে, বংশী সখারামের নাম ধরে চিৎকার করছিল।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

নিঃশব্দে খুলবে মনে করেছিল হরিদাস। কিন্তু শব্দ হল। অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ একবার গর্ভিণী মার্জারীর চাপা অথচ তীব্র গোঙানির মত। অনেক চেনা আর শোনা শব্দ। তবু একবার দাঁত খিঁচোল হরিদাস। রেগে নয়, অপ্রস্তুত হয়ে। তারপর মুখটা বাড়িয়ে দিল ঘরে। যেন অতর্কিতে আক্রমণের পূর্বে সতর্ক আততায়ী এসেছে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। তার পোকা খাওয়া চোখের পাতা আর রক্তাভ ছোট ছোট চোখ মেলে দেখে নিল ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ। এবড়ো-খেবড়ো মেঝে আর পলেস্তারা খসা দেয়াল। এখানে সেখানে কয়েকটা হাড়ল গর্ত। ঘরটার উদ্দীপ্ত চোখে চেয়ে থাকা তারার মত গর্তগুলি কালো। সারাটা ঘর স্যাঁতসেতে, ভেজা ভেজা, নোনা নোনা গন্ধ। মেঝেটা একদিকে বেশী ঢালু। যেন গড়িয়ে পড়ে ঠেকে আছে। একটা দড়িতে সস্তা আর রঙীন কয়েকটা শাড়ি; সায়া আর ব্লাউজ। সব এলোমেলো অবিন্যস্ত। একটা নড়বড়ে টেবিলের উপর ছড়ানো অল্পদামী প্রসাধন-সামগ্রী। স্নো, পাউডার, কাজলদানি, সাবান। আরো খুঁটিনাটি, নানারকম। মেঝের উপর লুটিয়ে আছে একটা শাড়ি। টেবিলের পাশে, তক্তার ওপরে হারমোনিয়ম। তার উপরে গোলাপী সায়া ঢাকা ডুগিতবলা। দুই ছড়া ঘুঙুর, একটা মাটিতে, আর একটা তবলার উপরে। ঘরের মাঝখানে, মেঝেয় একটা বই। লেখা রয়েছে নাটক, ছত্রপতি শিবাজী। মলাটে শিবাজীর ছবি।

সবটা মিলিয়ে কেমন যেন বেহায়া, উচ্ছৃঙ্খল কিন্তু করুণ। তারপর ঘুরে ফিরে এক কোণে কেন্নোর মত ঝাট পায়ে হরিদাসের

দৃষ্টি এগিয়ে গেল, আধো আলো, আধো অন্ধকার ঝাপসা কোণটা। দুপুরেও ওইরকম থাকে। ওইখানে বিছানা, ঢালুতে ঢলে পড়েছে। শুয়ে আছে তিনজন জড়াজড়ি করে। গায়ে গায়ে গুটিগুটি হয়ে। তিনটি রং মাখা মুখ।_ খানে খানে রং উঠে গেছে। ঠোঁটের রং গালে লেগেছে। কাজলের কালি লেপে গেছে চোখের কোলে। একজনের বেণী আর একজনের কাঁধে পেচিয়ে ধরেছে সাপের মত। কারুর শিথিল খোঁপা কারুর বুকের তলায় পড়েছে চাপা। অসাড়ে ঘুমুচ্ছে তিনজন। বিস্রস্ত, অবিন্যস্ত। এত অগোছাল যে চোখে লাগে। হাঁটু দেখা যাচ্ছে। নির্লজ্জ বলা যেত। কিন্তু তিনজনই মেয়ে। লজ্জার অবকাশ নেই। সব মিলিয়ে বিছানাটাও বেহায়া। রাতভর মাতামাতির উৎকট বেহায়াপনা, চটকানো বাসিফুলের মত ছড়ানো। নিষ্ঠুর উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহায় করুণ, গলা থেকে ফেলে দেওয়া উৎসব শেষের তিনটি মালার মত। কিংবা ভাঙ্গা খেলা-ঘরের অগোছালো তিনটি রং ওঠা পুতুলের মত।

হরিদাস যেন গুণে গুণে দেখল, এক, দুই, তিন। টায়টিকে গোনাগাঁথা, এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। এক, দুই, তিন, পায়ে পায়ে হরিদাস এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। খোঁচা খোঁচা কাচা পাকা গোঁপদাড়ি। কাচাপাকা লম্বা লম্বা চুল। যাত্রার দলের অধিকারীর মত। গোদা গোদা হাত পা, মোটা মানুষ। বুক খোলা আধময়লা সার্ট। যেমন তেমন করে কোঁচা দেওয়া এলোমেলো কাপড়। বয়স হয়েছে প্রায় পঞ্চান্ন, কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ মনে হয় এখনো। এই, বেলা ন'টাতেই তার পুরু ফাটা ঠোঁট পানের পিকে প্রায় কালো হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা প্রায় নেই-ই। সব জড়িয়ে রাতজাগা নেশাখোরের মত চেহারা হরিদাসের। তার ওপর রক্তাভ চোখের চাউনি সব সময় অনু-সন্ধিৎসু, সন্ধিগ্ধ। নাকের পাটা ফুলিয়ে যেন অষ্টপ্রহর জীবন্ত বিষের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে।

হরিদাস হাসল কিনা, বোঝা গেল না। চাপা খুশির আভাস

দেখা গেল তার গালের ভাঁজে। মেঝেয় লুটানো শাড়িটা তুলে ছুঁড়ে দিল দড়িতে। পশ্চিমদিকের জানালাটা খুলে দিল সশব্দে। দিয়ে ফিরে তাকাল বিছানার দিকে। কোন সাড়াশব্দ নেই। দক্ষিণের জানালাটা তেমনি করে দিল খুলে। সারসিগুলি নেড়ে দিল ঘটাং ঘটাং করে। ঘুম ভাঙ্গল না তিন জনের।

দক্ষিণের জানালার ধারে বারান্দা। তার নীচে উঠোন। সেখানে হাট-বাজারের গণ্ডগোল। চারদিকে স্বামী পুত্রের হুঙ্কার, ছেলে-বউয়ের কান্না। খুন্তি বেড়ি হাতার ঠন্ ঠন্, ঝন্ ঝন্।

বাড়িটা ছিল এককালে রাজবাড়ি। এক রাজার বাড়ি। এখন বাইশ রাজার রাজ্য। চৌত্রিশ ঘরে বাইশ ভাড়াটের আস্তানা।

তার মধ্যে এক রাজা হরিদাস। হরিদাস মুখুটি। দোতলায় পশ্চিমের প্রান্ত ঘেঁষে তার সীমানা। জায়গা একটু বেশী পেয়েছে কেননা এইদিকটা নড়বড়ে, ভাঙ্গাচোরা। সারা বাড়িটা টাল খেয়েছে পশ্চিমে। চাপা পড়লে, এরা সবার আগে পড়বে। সেইজন্য ভাড়াও কম। সাড়া শব্দও কম এদিকটায়। লোক কম আছে বলে নয়। গুটি ছয়েক ছোট-মাঝারি ছেলে মেয়ে আছে আরো। আছে হরিদাসে স্ত্রী স্নেহলতা। হরিদাসের কড়া শাসনে সবাই জুজুবুড়ি। পা টিপে টিপে চলে। ছয় ছেলেমেয়ের খেলাঘরে ভুতুড়ে বাড়ির ফিস্‌ফিসানি। ইশারায় চোখে চোখে কথা। শব্দ হলেই সর্বনাশ। তৎক্ষণাৎ সেখানে হরিদাসের দাঁত খিচনো ভয়ঙ্কর মূর্তি আর উদ্যত থাবা। ছিঁড়ে ফেলবে যেন।

কড়াকড়ির বাড়াবাড়ি ততক্ষণ, যতক্ষণ ঘুম না ভাঙ্গে এ ঘরের। এ ঘর, লোকে বলে, রাজা হরিদাসের রংমহল। ঘুম ভাঙ্গলে শাসন একটু শিথিল হয়।

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গছে না। পশ্চিমে হেলে-পড়া বারান্দা। ভাঙ্গা তার রেলিং। তার ওপারে ঘন বন। বন শিউলীর অরণ্য। মাঝে মাঝে বেঁটে ঝাড়ালো রাংচিতের বিস্তার। সেখানে পাতার বুকে

রোজ শওয়ার হয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, হুটোপুটি খেলছে। আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ছায়া পড়ছে। শরতের সবুজ কালো হয়ে উঠছে। আরো পশ্চিমে টালিখোলা ছাওয়া পাড়ার মাথা। তারও পশ্চিমে ধোয়া মাজা ঝকঝকে নীল আকাশ। অনেক দূরের একখানি হাসকুটে উজ্জ্বল মুখের মত। সব মিলিয়ে বোঝা যায়, বেলা তার লাগাম ছেড়ে দিয়েছে। অসহ্য, অস্থির হয়ে উঠল হরিদার। মেঝে থেকে তুলে ঘুঙুরের ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল। নড়েচড়ে উঠল বিছানাটা। ঘুমন্ত আড়মোড় ভাঙলো দু'একজন। ঘুম ভাঙলনা। দুম্ করে হরিদাস ডুগিটার ওপর ছুঁড়ে দিল ঘুঙুরের গোছা আর তবলার উপর একচাটি। দিয়ে ও মুখ ফিরিয়ে আড়চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে রইল লাল ভ্যাবভ্যাবা চোখে।

চম্‌কে উঠে বসেছে একজন। তার কাজল লেপে যাওয়া ঘুমন্ত চকিত চোখ। আর একজন উঠতে গিয়ে আধশোয়া হয়ে জোর করে তাকিয়েছে মাতালের মত। তৃতীয়া শুয়ে শুয়েই চোখ পিটপিট করছে। কয়েক মুহূর্ত। আবার ঢলে পড়ার উপক্রম করল তিনজনেই।

হা হা করে উঠল হরিদাস, না, না, না আর না। অনেক বেজেছে। দশটা, এগারটা, বারটা······দশটা, এগারটা, বারটা? তিনজনেই আড়ষ্ট হয়ে রইল তেমনি। হরিদাস আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে চাপা মোটা গলায় বলতে লাগল, গেটআপ, গেট্‌আপ, গেট্‌আপ। ঠাট্টা নয়, হাসি নয়, হরিদাসের সোহাগ কণ্ঠের ওইটি হুকুম। তবু পারুল বোধহয় সর্বকনিষ্ঠ, বড় করুণভাবে আধবোঁজা চোখে বলল, প্রায় ভোর চারটেয় শুয়েছি, আর পনের মিনিট···

আরে বাপ্‌রে বাপ্! প্রায় আদরের চমকানিতে লাফিয়ে উঠল হরিদাস, হলধর এলো বলে। রামকানায়েরও দেরি নেই। পাবলিক নিয়ে কারবার। সব টিপটাপ্ তৈরী হয়ে নিতে হবে। সময় নেই, সময় নেই। পনর মিনিট নয়, এক মিনিট নয়···। প্রায় সুর করে বলতে বলতে চীৎকার করে উঠল, একটুও

নয়। তেমনি গলায় দরজার দিকে ফিরে বলল, বড় বউ—চা, তাড়াতাড়ি। বীণা বিছানা তুলে দিয়ে যা, ঘর ঝাঁট দে …

ঘরটা যেন এতক্ষণ ঘুমের ঢুলুনিতে ঢালু হয়েছিল হঠাৎ সোজা হয়ে গেল।

হরিদাস একাই একশো। অন্ধকার এ ঘর ছেড়ে যাবার নয়। কিন্তু ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই আর এ ঘরে। উঠতে উঠতে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়েছে তিনজন। তিনজন, বেলা, যুঁই, পারুল। বেলা আর যুঁই হরিদাসের মেয়ে। বাপ মা হারা মেয়ে পারুল। বেলা, যুঁইয়ের মাসতুতো বোন। হরিদাসের মৃতা শালীর কন্যা।

রংমাখা মুখে তাদের রূপ ধরা কঠিন। তবু বোঝা যায়। বেলা ফর্সা দোহারা, একটু খাটো। আলুথালু খোলা চুল জড়িয়ে পড়েছে কোমর ভরে! পারুল অন্য ঝাড়ের। তবু মিল আছে বেলার সঙ্গেই। কম বয়সের ছাপ রয়েছে চোখে মুখে গায়ে। তার খোপা ভেঙ্গে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। যুঁই শামাঙ্গিনী। একটু লম্বা, একহারা। তার দুপাশে দুই শিথিল বেণী। কেউ চোখে মুখে, হাতে পায়ে ঠিক রূপসী নয়। একটি আটপৌরে মেয়েলী চটকে তারা হঠাৎ যেন অনেকখানি সুন্দরী হয়ে উঠেছে। শাণিত দীপ্তি নেই রূপে, হঠাৎ খানিকটা ভালোলাগা, চোখ সওয়া বেলা যাওয়া মিঠে রোদের মত আলো ছড়ায়। দ্যুতি নেই, জ্যোতি আছে। একটি অনাড়ম্বর প্রাণের সুরের মত। ভার লেগেছে বয়সের। ধারটুকুনি জীবন্ত, উঁকি দিয়ে আছে এখনো। বাইশ চব্বিশ ছাব্বিশ হতে পারে। হতে পারে ছাব্বিশ আটাশ তিরিশের যৌবন। কিন্তু জল না পাওয়া চারা গাছের মত ঠেকে আছে যেন আঠারোতে। মরে বেঁচে আছে অষ্টাদশীর ঝিলিকটুকু।

কারুর আঁচল লুটোচ্ছে। কাঁধ থেকে খসে পড়েছে জামা। অসমান বুক। রং ওঠা ওঠা তিনটি পুতুল। আঁকা ভ্রূ তুলে, কাজল কালো চোখে, চোরা দৃষ্টিতে তিনজনে দেখল হরিদাসকে। তারপরে পরস্পরকে। তারপরে সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাসের কোরাস।

সারা রাত্রির গ্লানি সারা গায়ে। ঘুম জড়ানো চোখে, টলে টলে দড়ির কাছে গিয়ে, তিনজনের ছ'টি হাত টান দিল শাড়ীতে। শাড়ী টানতে ব্লাউজ, ব্লাউজ পাড়তে সায়া। যা পেল, তা-ই নিয়ে গায়ে গায়ে হেলান দিয়ে বেরিয়ে গেল তিনজনে।

সেইদিকে একবার দেখে চকিতে ফিরে তাকাল হরিদাস। কুটিল ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বুলালো চারদিকে। অতবড় চেহারাটা নিয়ে দ্রুত নিঃশব্দে গেল টেবিলের কাছে।

সায়া উঠিয়ে দেখল বাঁয়া তবলা। ঢাকনা খুলে দেখল হারমোনিয়মের রীড। ভয়ে ভয়ে সন্দেহে কী যেন খুঁজছে। খোঁজে রোজ সকালে বিকালে সন্ধ্যায়। বড় বড় চকিত উদ্দীপ্ত চোখে, ইঁদুরের মত আনাচে কানাচে।

এ যেন রূপকথার রাক্ষসপুরী। দৈত্য তার হরিদাস। তিন মেয়ে, বন্দিনী তিন রাজকন্যা। রাক্ষসপুরীর গচ্ছিত সোনা, জীবন ও যৌবন। ওরা জানে হরিদাসের মরন ভোমরার সংবাদ। হরিদাস খোঁজে ওদের অদৃশ্য রাজপুত্রের অন্ধিসন্ধি: যে ওদের নিয়ে উধাও হবে, ভোমরার প্রাণ টিপে মারবে হরিদাসকে। তা হতে দেবে না হরিদাস। প্রাণ থাকতে নয়। ওরা-ই হরিদাসের জীবন সংসার-সুখ-আনন্দ। খোঁজে আর ফিস্‌ফিস্ করে বলে, কিছু নেই, কিছু নেই। খুশিতে নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঝাঁপ দেয় বিছানায়। বিছানার ওয়ার, বালিশের তলা সব খোঁজে। চুলের কাঁটা, ফিতে, টুকিটাকি জিনিষ। হঠাৎ এক টুকরো কাগজ।

ধক্ করে ওঠে বুক। ফেটে বেরোয় চোখ। বিন্দুবিন্দু করে ঘামে সারা মুখ। ফিস্‌ফিস্ করে পড়ে রুদ্ধনিশ্বাসে, প্রেয়সী, নিশি-দিন সতর্ক চোখ ঘিরে থাকে তোমাকে। আমি ফিরি ছায়ার মত। অসহ্য! মনে হয়, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি সহস্র চোখের সামনে। হৃদয়ের এ বিরহ যাতনা······

চাপা মোটা স্বরে আতঙ্কে আর্তনাদ ওঠে হরিদাসের গলায়। পর মুহূর্তেই হেসে ওঠে গোঙা সুরে। নিশাচর রক্ত চোখে বহে

খুশির বন্যা। পার্ট! থিয়েটারের পার্ট, নায়িকার প্রতি নায়কের আকুতি। গতকাল রাত্রে যে নাটক করে এসেছে। বেলার প্রেম-পত্র নয়, যুঁইকে ছিনিয়ে নেবার চিঠি নয়, পারুলকে আলিঙ্গনের ডাক দেয়নি কেউ। শুধু পার্ট! চাপা নিশ্বাসের শব্দে চমকে ফিরে তাকায় হরিদাস। বিষাদ মূর্তি স্নেহলতা। হরিদাসের বউ। হাতে চায়ের কেৎলী আর গেলাস। বেলার মত দোহারা, তার মত ফর্সা। আটচল্লিশে বাঁধুনি ঢালাঢিলা, মাথার চুল রূপালী। যেন রূপালী দুই বালুচরের মাঝখানে শ্রাবণের লাল জলের মত চুওড়া সঁাথিতে লেপা সিঁদুর।

তার দিকে ফিরে খুশির আবেগে বলে উঠল হরিদাস, পার্ট।

পরমুহূর্তেই তার গালের ভাঁজগুলি কড়া হয়ে উঠল। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। কঠিন অপলক হল রক্তাভ চোখ। আর আরক্ত ছলছল চোখে, কেৎলী গেলাস টেবিলে রেখে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল স্নেহলতা।

স্বামী-স্ত্রীর এমনি ভাব চলে আসছে আজ ছ'বছর। যবে থেকে দেশ ছেড়ে এসেছে, দেশ ভাগাভাগির পর। ধলেশ্বরীর ওপারের শ্রীনগর ছেড়ে আসার পর থেকে শুধু এমনি চাওয়া। এমনি চোখ ছলছল করা। আর একদিকে পাথুরে কাঠিন্য, প্রস্তরবৎ চাউনি, অবিচল ও নিষ্ঠুর। তবু মুখ তোলে স্নেহলতা। বলে, আর কতদিন?

হরিদাস বলে, যতদিন চলে।

ব্যাকুল গলা কেঁপে ওঠে স্নেহলতার, ওরা যে মেয়ে! তোমার ছেলে নয়।

জানি।

তবে আর কতদিন? ওদের যে মেয়ের বয়স পার হয়ে গেল। মা হওয়ার বয়সে এসে ঠেকে আছে খালি কলসীর মত। চেয়ে দেখনা, হাতে পায়ে কোমরের গোছে। জন্মো-বিধবার মত লক্ষ্মী-ছাড়ী গলার কাঁটা করে রেখেছ। মনেও কি পড়ে না, ওই বয়সে মুখুটি বাড়ির বড় বউকে?

চুপ! চু-প। চাপা মোটা গলায় ধমকে ওঠে হরিদাস। যেন কোন অবৈধ কথা উচ্চারণ করেছে স্নেহলতা। যে কথা নির্বাসিত হয়েছে বহুদিন হরিদাসের বদ্ধপুরী থেকে। খোঁচাখাওয়া জানোয়ারের মত চোখ দুটো তার আরো গর্তে ঢোকে, জ্বলে অঙ্গারের মত ধ্বকধ্বক করে। বিশালবপু, মূর্তি তার ভয়ঙ্কর দেখায়। শির ফোলা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, জানি জানি। তারপর? এই রাজবাড়ির ভাড়া, তোমার চুলোর আগুন, হাঁড়ির পিণ্ড, আরো ছ'টি ছেলেমেয়ে, তুমি, আমি, আমরা কি করব? আমাদের দিন, রাত্রি, গতর, পেট—

বলতেও ভয়। আতঙ্কে যেন কাঁপে হরিদাসের পুরুষগলা।

স্নেহলতা বলে, তার জন্য বলি হবে ওরা?

কিসের বলি?

ওদের প্রাণ, মন, দুঃখ। ওদের মেয়ে প্রাণ। তুমি বাপ, মেসোমশায় হয়ে পার না রক্ষা করতে। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ……

থাক। ঢের শুনেছি, অনেক হয়েছে। হরিদাসের তিক্ত তীব্র স্বর চাবুক মারে স্নেহলতার মুখে। যুক্তিহীন আক্রোশে ফুলে যেন উদ্যত হয় হিংস্র আঘাতের জন্য। থতিয়ে গিয়ে স্নেহলতা ঝুঁকে পড়ে কাজে।

সরে আসে হরিদাস। আবার খোঁজে। কোথায় না জানি আছে কোন অন্ধিসন্ধি। দৈত্যপুরীতে শত্রু স্বয়ং দৈত্যপত্নী। বিশ্বাস কি! কখন সর্ব্বনাশ আঘাত করবে বজ্রের মত। দিবানিশি পাতার শিরে শিরে পোকার মত ফিরছে সে মেয়েদের পিছনে পিছনে। কাছ ছাড়া করেনা কখনো।

যত ভাবে, তত আরো অসহায় ক্রোধে জ্বলে হরিদাস। অসহায় ক্রোধ শুধু নয়, যেন ধুকুধুকু স্পন্দন যাবে বন্ধ হয়ে হৃৎপিণ্ডের। মনেও কি পড়েনা সেইদিন! ছ' বছর আগের দিন! ভাগাভাগি হল দেশ। শ্রীনগরের মুখুটি বাড়ির বড় শরিক পালিয়ে এল দেশ ছেড়ে। সেখানে দুধে ভাতে ছিলনা। ছিল মোটা ভাত কাপড়ে।

বিলে ছিল শাপলা, কলমি, জঙ্গলে ছিল কচু। বুক দিয়ে হিঁচড়েও চলা যেত। বুদ্ধির দৌড়েও ভাগচাষীর কাছে জেতা যেত দু' কাঠার লাল চাল।

আর এখানে! এত কঠিন, বুক হিঁচড়েও চলা যায় না। ফেটে ফেটে রক্ত বেরোয়। প্রাণ যায়। একটা বছর পাগলের মত ঘুরেছে হরিদাস। অফিসে আদালতে, সেকরা আর মুদী দোকানে। হিসাব লেখক হয়েও যদি ঢোকা যায় কোথাও। আর দিনে দিনে ভেঙ্গেছে পুঁজি। হায়রে পুঁজি, তাঁবার তারে লেপা সোনা। চামড়ার ঘসটানিতে শুধু ক্ষার। ফুটো পয়সা নিয়ে ছেলেমানুষ হামলা করে খাবারের দোকানে। দোকানী হাসে নির্বিকার। সংসারে বুড়ো মানুষের সেই পুঁজি যে শুধু অপমান।

সেই সময়, বৈশাখের ক্ষুধার দাহ নিয়ে ফিরতি পথে দেখা দিল পাড়ার বখাটে ছেলেটা। দলবখাটের শিরোমণি। আড্ডা দেয় রকে বসে। একে তাকে কাটে টিপ্পনী। গান গায়; কখনো বিশ্বজয়ী গাণ্ডীবের মত চ্যালেঞ্জ করে ভীষ্ম কর্ণকে। কখনো ষড়যন্ত্রী কণ্ঠে হাসে শকুনি হয়ে কিংবা অট্টহাস্যে পাড়া কাঁপায় কেদার রায়ের গোলন্দাজ কার্ভালোর বীরত্বে।

হরিদাস ভাবত, এই রকবাজগুলির হতভাগ্য বাপেদের কথা। মেয়ের চেয়েও গলার কাঁটা, এই জন্মবেকারগুলিকে গিলতে দেয় কে? তারই নেতা, নাম শিবনাথ। ডাকে সবাই শিবে নয়ত শিবু। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কথা বলে নাটুকে ঢং-এ। কিন্তু বোকা বোকা চাউনি ও হাসি।

হরিদাসকে ডাকল, এই যে কাকাবাবু।

কাকাবাবু? ফিরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত হা হয়ে গেল হরিদাস। একে ক্ষুধার দাহ। তার উপর বিরক্তি ও বিস্ময়। কথা বলতে পারেনি। একেবারে কাকাবাবু। যেন কতকালের!

শিবু বলল, আপনার মেয়ে গান করতে পারে। আমাদের ক্লাবের ফাংশানে যদি গাইতে দেন, এই পাড়াতেই......

হাত কচলে কচলে হাসিতে একেবারে বিগলিত। কিন্তু গান গাইতে পারে? কে, কোন মেয়েটা? ও হ্যাঁ, যুঁই, যুঁইটা দিন-রাত্রিই গুনগুন করে। সে খবরও জানে এরা? হুঁ পাড়ার নাড়ি-নক্ষত্র না জানলে অতক্ষণ রকে কাটে কি করে। খেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে থমকে গেল হরিদাস। থাক, চটানো ঠিক হবে না। জানা শোনা হওয়া ভাল। সম্মান! হিন্দুস্থান, কলকাতায় ও মফঃস্বলে আজকে কে কার সম্মান দেখছে খতিয়ে। রাজবাড়ির একুশ ভাড়াটের সংবাদ তো আর অজানা নেই। মত দিয়ে ফেলল সে।

সেই শুরু। যুঁই একলা নয়। পারুলও একটু আধটু গাইতে পারে। চেষ্টা করলে নাকি নাচতেও পারে। বেলার আবৃত্তির দিকে ঝোঁক আছে। জানতনা শুধু হরিদাস। স্নেহলতার ঘোরতর আপত্তি। কে শোনে। যা তা হলেই হল। হরিদাস সঙ্গে নেই? হরিদাসকেও ডেকে নেয়, নিমন্ত্রণ করে। খাওয়ায় এটা সেটা। খাতির করে। বিরক্তও যে না হয় হরিদাস, তা নয়। ভয় পায়। কিন্তু খাওয়াটা! ওটা নেশার মত ধরে যাচ্ছে।

আর ওই তিনজুটির তো কথাই নেই। হঠাৎ যেন মাঝে মাঝে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অগণিত ভক্ত ঘুরঘুর করে কাছে কাছে। মন ভোলাবার সব পেখম খোলা গোলা পায়রার দল। তিন বোন হাসে খিলখিল করে।

প্রথম প্রথম একটু আধটু গান, আবৃত্তি। তারপরে আর একটু, ছোটো খাটো পার্ট। আস্তে আস্তে আড় ভেঙ্গে যায় লজ্জার। একদিকে ধিক্কার দুর্ণাম, আর একদিকে প্রচুর নাম। পাড়ার, বে-পাড়ার ছেলেদের প্রচুর ভিড়। হাফপ্যান্ট থেকে গোঁফ কামানো, সকলের বেলাদি, যুঁইদি, পারুলদি আর কাকাবাবু।

হঠাৎ শিবু একদিন বলল, কাকাবাবু এমনিতে আর নয়।

হরিদাস বলল, কি ভাবে?

শিবু মাথা ঝেকে বলল, পয়সা চাই। টাকা দিতে হবে। ওসব ফোকটে আর হবেনা, বুঝলেন। ষ্টেজ ভাড়া করতে তিনশ

টাকা দেবে, আর পার্টের জন্য টাকা দেবেনা? তাও আবার মেয়েমানুষ।

'মেয়েমানুষ' শব্দটা এমনভাবে বলল যে নিজেই একটু থতিয়ে গেল শিবু।' কিন্তু মানিয়ে নিল ঠোঁট বাঁকিয়ে। বলল, আমার বাবা ওসব নেই। ভদ্দরলোক তো কি! কাজ করে টাকা নেওয়া যায়, নাটক করে টাকা নেওয়া যায় না? আরে আমি যে শিবে গাঙ্গুলী, রাতপিছু পাঁচটাকা না দিলে শিবে গঙ্গোর অর্জুন, কার্ভালো আর শকুনি দেখতে হবেনা। শিশির ভাতুড়ি না হতে পারি, শিবে গঙ্গো তো।

টাকা! টাকা? একেবারে সোজা হৃৎপিণ্ডে এসে বিঁধল কথাটা। একে বলে মরমে পশিল গো! সেই হল পাকাপাকি বন্দোবস্ত। বাতাসে বাতাসে গেল সংবাদ। কাছে কাছে, দূরে দূরে, দূরান্তরের ক্লাব আর অ্যামেচার দলগুলি ছুটে এল মেয়ে অভিনেত্রীর জন্য।

প্রথম প্রথম বাহন শিবু। দরাদরির ভার শিবুর। ভদ্রলোকের মেয়ে, সেটুকু স্মরণ করিয়ে দেবার ভারও তার। খবর্দার! বে-ইজ্জৎ না হয়।

কী বিচিত্র নগদ মূল্য! হরিদাসের লুব্ধ চোখ হল সতর্ক। মূলধন তিনটি, তিনটি মেয়ে। ওখানে না হাত পড়ে কারুর। টাকা, সত্যি টাকা! অনায়াস-লভ্য। অভাবের দুর্গদ্বারে ধরেছে ফাটল। বিচিত্রবেশিনী লক্ষ্মী দিয়েছে দেখা। মেয়েদের মন নিয়ে কথা। যদি একটু এদিক ওদিক হয়, দূর হয়ে যাবে লক্ষ্মী।

হরিদাস কাছছাড়া করেনা শুধু নয়। উইংসের পাশ থেকে গ্রীনরুম পর্যন্ত নিঃশব্দে ভূতের মত ঘুরে ঘুরে ফেরে। সিরাজদ্দৌল্লা যখন গ্রীনরুমে লুৎফাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের বাড়িটা কোথায়? মাঝখানে ছুটে এসে দাঁড়ায় হরিদাস। ও তো লুৎফা নয় এখন, পারুল। যা বলো আমায় বলো। ষ্টেজের বাইরে যদি ঘোরে চন্দ্রগুপ্ত হেলেনের পেছনে কিংবা কর্ণ দাঁড়ায় মাতা কুন্তীর

পাশে, হরিদাসের পোকা খাওয়া চোখের পাতা অপলক নির্ণিমেষে সেখানে। কুন্তী হেলেন লুৎফা নয়, বেলা যুঁই পারুল। যা কর, তা মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে। মূল্য তার গুণে গুণে নেবে হরিদাস। তারই প্রথম সোপান হিসাবে, লুব্ধ সন্দিগ্ধ চোখের কামান নিঃশব্দে ফিরল শিবুর মুখোমুখি। আর এক পা-ও নয়।

তা বললে কি হয়! শিবু ওসব বোঝে কম। সে আসে কামানের তলা দিয়ে, এপাশ ওপাশ দিয়ে। এ এক নিঃশব্দ গাদি খেলার মত। পথ যত আটকায় হরিদাস, শিবু আসে অবলীলাক্রমে। মুখে কিছু বলে না হরিদাস, মায়াবী দৈত্যের মত ছায়া হয়ে ফেরে। শিবু অত বোঝে কি বোঝে না, কে জানে। সে বলে, আসুন বেলাদি, ঘসেটির পার্টটা আপনার একটু দেখি। কিংবা, যুঁইদি, আমি কৃষ্ণ, ট্রাই করত সুভদ্রার ইলোপ হওয়ার সিনটা। বলে পারুলকে, দক্ষ-ভীতি করিওনা সতী। রুদ্র এ বক্ষমাঝে বীণাসম বাজিবে যে তুমি!

মনে মনে হরিদাস বলে, শয়তানের বাচ্চা! চোখ রাঙ্গায় তিন মেয়েকে। চোখ রাঙ্গায় সর্বত্র, পথে ঘাটে গাড়িতে, গ্রীনরুমে, উইংসের ধারে। ড্যাবা ড্যাবা চোখে চায় উত্তেজিত অন্ধকার মঞ্চে। আজ ছ' বছর ধরে পাকাপাকি হয়েছে ব্যবস্থা। বর্ষা শেষ থেকে মরসুম শুরু হয়। শারদ উৎসবের মাতামাতি থেকে, কালবৈশাখী পর্যন্ত, প্রোগ্রামের ইতি নেই। প্রায় প্রতি রাত্রে নাটক, হরিদাসের সারা বছরের খরচ। এ সময়ে তার চোখ আরো সন্দিগ্ধ, অনুসন্ধিৎসু।

কাল রাত্রে নাটক গেছে। আজো রাত্রে আছে। দুদিন বাদেই, পূজোর দিন পুরোপুরি। তারপরে আবার, আবার······

ক্রুদ্ধ চোখে ফিরে তাকাল সে স্নেহলতার দিকে। বড় বউ মানে না তার কালাকানুন। বেআইনী কথা বলে আইনরচয়িতার ঘরে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থাক, ফিরে যাক স্নেহ তার কাজে। এ ঘরে আসছে তার তিন মেয়ে, এখানে স্নেহলতার ওই চোখের চাউনিও নিষিদ্ধ।

তাই চলে যায় স্নেহলতা।

তিন মেয়ে আসে। সভস্নাতা, এলানো চুল। ঘাড়ে পিঠে চোখে মুখে চূর্ণ কুন্তল। তেল নিষিদ্ধ অভিনয়ের দিনে। সস্তা শাম্পুতে তিন এলোকেশিনী। মুক্তা বিন্দুর মত ঝিকিমিকি জলকণা চুলে। রঙ্গীন শাড়ির ফেত্তাতেও যেন তিন বৈরাগিনী। এখনো যেন ঘুমঘোরে আঁচল লুটোয়, জামার বোতামে বিরাগ। গায়ে গায়ে ঢলে ঢলে হেসে হেসে আসে তিন বোন। চাপা একটি সুগন্ধের সঙ্গে বিচিত্র একটু হাসির নিক্বণ। সব থেমে যায় ঘরে এসে। হরিদাসের কাছে। হরিদাসের এ বিচিত্র রংমহল। আধো অন্ধকার ঘরটায় হাওয়া ঢোকে না। অদৃশ্য দৈত্যের থাবা যেন ঘিরে আসে চারদিক থেকে। হাসতে ইচ্ছে করেনা।

রং ধোয়া তিনটি মুখ। তবু ভোরের তাজা ফুল নয়। ধুয়ে ধুয়ে ও গ্লানি কাটেনা চোখের কোলের। বৃন্তহীন ফুলদানির গুচ্ছ। অনেক হাতের পেষণের ও গন্ধের কলঙ্ক কাটেনা সারা গায়ের। আজ শুধু অবসাদ।

একদিন ছিল খেলা খেলা। কিছুটা ভাললাগা। আজ মেসিনের ডায়ামেটারে ঘূর্ণন শুধু কর্তব্যের খাতিরে। একটু এদিক ওদিক নয়। প্রাণ খুলে হাসলে ও নিষ্পলক সর্পচোখ দেখা দেয় সামনে। স্নেহলতা মা ও মাসী। কিন্তু কথা বলে না তিনজনের সঙ্গে। যেন হরিদাসের ব্যবসার দাসী ওরা সেধে হয়েছে।

তিন বোন এল। এসে চা ঢেলে নিল গেলাসে। তারপর শুরু হল রাত্রের প্রস্তুতি। প্রথম উদ্যোগ নেয় হরিদাস নিজেই, পণ্ডিত মশায়ের ভূমিকা। রুক্ষ মূর্তি নয়, হেসে ব্যস্ত হয়ে বলে, আজ কি প্লে? চাণক্য? নিজেই খুঁজে পেতে বের করে বই। মুরার পার্ট নিয়ে বসে বেলা, ছায়া নেয় পারুল, যুঁই পায়চারী করে হেলেনের ভূমিকায়, বোঝে কতটুকু কে জানে। সমঝদারের মত খুসি রক্ত চোখে দেখে হরিদাস। মাথা নাড়ে, বলে, বাঃ!

তারপর গান, নাচ রিহার্সেলের পর রিহার্সেল।

পাঠে বসিয়ে পণ্ডিতমশাই-ই যায় সংসারের অন্য কাজে। অমনি ছড়িয়ে পড়ে ঘরময় পাটের কাগজ। পায়ের নুপুর যায় ছিটকে। হারমোনিয়মটা নিঃশব্দে পড়ে থাকে সাদা রীডের দাঁত বের করে।

তিন বোন হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেয়। বলে, নিকুচি করেছে চাণক্যের।

আর একজন, মাইরি আর পারিনে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে প্রেম করতে।

পারুল বলে ঠোঁট ফুলিয়ে, আর আমাকে যে কেঁদে কেঁদে গাইতে হয়?

হেসে ওঠে তিনজনে। বুঝি নিজেদেরই বিদ্রূপ করে ওরা হাসে। ওইটুকু অবাধ স্বাধীনতা ওদের।

হেলে পড়া, বেঁকে পড়া রাজবাড়ির এ ঘরটা হঠাৎ সত্যি রং-মহল হয়ে ওঠে। হাড়স গর্তগুলি এবার হাসে মিটিমিটি চোখে। দৈত্যপুরীর মন্ত্রে মরা রাজপুত্তেরা যেন। পশ্চিমের ভাঙ্গা অলিন্দের ওপারে বন শিউলীর বনে রোদ খেলা করে। রাচিতের ঝাড়ে লাগে ধীরি ধীরি নাচ। রংপাখা মেলে ওড়ে ফড়িংএর ঝাঁক। দূর আকাশের হাসকুটে মুখখানি অলিন্দের ধারে এসে ভিড়ে যায় এই তিনজনের সঙ্গে। তিনজন হয় চারজন।

পারুল বলে ফিসফিস করে, জানিস ভাই, যে লোকটা কাল্লকে আমার স্বামীর পার্ট করছিল, সে লোকটা কি পাজী! হাত দুটো টিপে টিপে মাইরী ব্যথা করে দিয়েছে।

যুঁই বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে, বোধ হয় সত্যি স্বামী হতে চেয়েছিল।

পারুল চিমটি কেটে বলে, তোর মুখপুড়ি।

তারপর ছোট্ট মেয়েটির মত বলে গাল ফুলিয়ে, যা হাবলা চেহারা।

সেতারের প্রথম আলাপের মত হাসি শুরু হতে থাকে। এদিকে ওদিকে ছোট ছোট ভাই বোনগুলি শুরু করে উঁকিঝুঁকি মারতে। বেলার লজ্জা করে।

বড় কিনা! তবু বলে থেমে থেমে, কেন, যে লোকটা আমার বাবুর পার্ট করলে? সে ব্যাটা তো হু' দুবার গায়ের উড়নীই ফেলে দিল আমার গায়ে। আবার বলে কিনা—, বলে বেলা দেখায় নকল করে—'মাইরী, এরপরে কারুর সঙ্গে আর নাটক করতে পারব না জানেন বেলাদি।'

যুঁই টেনে টেনে চোখ ঘুরিয়ে বলে, মা-ই-রী?

তারপরেই হাসি। আলাপের পরে হাসি ওঠে গমকে। এ শুধু হাসি নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে হাসির চেয়েও তীব্র কান্না, তাদের মেয়েজীবনের অপমানের।

তারপর যুঁই বলে, আর সেই পাঁচটাকার নোট?

কোন পাঁচটাকা?

বিশ্বকর্মা পূজোর দিন সিরাজদ্দৌলা নাটকে? বিশ্বাসঘাতক মির্জাফর, দাড়ি নেড়ে পাঁচটাকার নোট ফেলে দিয়ে গেল আমার পায়ের কাছে। দিয়ে আবার দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল, আলেয়া নোট তোলে কি না তোলে।

তারপর?

আমি ওমনি গ্রীনরুমের একজায়গায় লুকিয়ে দেখতে লাগলাম, মির্জাফরের কীর্তি। আর নোটটা মাইরী, চোখে পড়্‌ত পড় পেন্টারের চোখে। সে বেচারী কুড়োতে যাবে, মির্জাফর লাফিয়ে হাজির, আমার, আমার, পড়ে গেছে, হেঁ হেঁ······

ভাঙা রাজবাড়িতে হাসি মাতাল হয়ে ওঠে। দৈত্যের ছম্‌ছমে মায়াপুরীতে এক মানুষিক মোহের রং ছড়ায়। হাসি শুনে রান্না-ঘরে বসে, গায়ে কাঁটা দেয় স্নেহলতার। যেন ঘাড় মটকাবার উল্লাসে হাসে সর্বনাশী প্রেতিনীরা।

এমনি সময়, চকিতে আবির্ভাব হয় হরিদাসের। ফিরে দেখেনা

মেয়েদের দিকে, কথাও বলে না। যেন হঠাৎ এসে পড়েছে। পোকা খাওয়া নিশাচব চোখে তাকায় দক্ষিণের উঠোনে, নয়তো পশ্চিমের বনে। হঠাৎ হাসি বন্ধ। যেন কোন মুখখোলা পাতালের নির্ঝরের কল্‌কল্‌ শব্দ উঠেছিল সপ্তমে। পাথর চাপা পড়ে সে শব্দ হঠাৎ হারায়। রুদ্ধশ্বাস বাতাস আবর্তিত হয় নড়বড়ে ঘরের কোণে কোণে। কিম্ভূতাকৃতি মাকড়সার ঝুলগুলি মাথা নাড়ে জুলজুলে চোখে।

ছত্রাকারে ছড়ানো পার্ট চটপট কুড়োয় আবার তিনজনে। ব্যস্ত হয়ে বলে বেলা, হে পুত্র, দাসীপুত্র নহে শুধু তোর পরিচয়। বেলাকে আড়চোখে দেখে যুঁই বলে, কী আশ্চর্য দুখানি নয়ন সেই মৌর্য রাজপুত্রের।

পারুল বলে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, সখী, গ্রীক নন্দিনীর নীলচক্ষু যে হৃদয় করেছে জয়, সে হৃদয় কালোচক্ষু দেখিতে না পায়।

হরিদাস হেঁড়ে গলায় স্নেহ ঢেলে বলে, বাঃ! আজ নির্ঘাৎ তিনবোনের তিন মেডেল!

তারপর আসে আধবুড়ো রামকানাই আর বুড়ো হলধর। রামকানাইয়ের ডিগডিগে ঝাঁকড়া চুল, দন্ত নিয়ত বিকশিত। কোনকালে ছিল সে এক যাত্রাদলের ম্যানেজার। লোকে বলে রামকানাই অধিকারী। আর অপুরদন্তী মাজাভাঙ্গা বুড়ো হলধর ছিল তার ড্যান্স মাষ্টার। লোকে বলে নাটুয়া হলধর। রামকানাই লিকলিকে হাতে ধরে হারমোনিয়ম। নাটুয়া হলধর কোমর ঘুরিয়ে এবড়ো খেবড়ো মেঝেয় গুনে গুণে পা ফেলে বলে, এক্‌-দুই-তিন্‌, এক্‌-দুই-তিন্‌-চার……

শুরু হয় নাচ ও গানের রিহার্সেল। নাচের চেয়েও তিনবোনের শরীর কেঁপে থরো থরো, আধা কান্না আধা হাসিতে। ঢিলে স্ক্রু নড়বড়ে মাজা হলধরের যে পরিমানে দোলে, চারবার পা ফেলতে তার অনেক বেশী সময় লাগে। আর তিন মেয়ের শরীরের কাঁপুনি

দেখে সে ভাবে, এরা খাঁটি নৃত্য-পটীয়সী। নইলে এমন করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপায় কি করে।

তা ছাড়া চোখও ধাঁধায় একটু। তিন মেয়ের লুটনো আঁচল আর শিথিল জামার সুডোল বাঁকের দোলায় তার শীর্ণ নালীকণ্ঠে শ্বাসরুদ্ধ হতে চায়। রামকানাই বলে ওঠে, উ হুঁ হুঁ, হল না। চোখে একটু ঝিলিক হান্‌তে হবে।

বেলা বলে, কেমন করে?

পারুল বলে, এমনি করে। ব'লে চোখ ঘুরিয়ে হাসে।

যুঁই বলে, হল না। এই গ্যাখ্, বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, বুকে একবিচিত্র কাঁপন দিয়ে, ভ্রূ বাঁকিয়ে ছোট চোখে চায়।

রামকানাই ও হলধর যুগপৎ বলে ওঠে, এ্যাই, এ্যাই ঠিক। আর কোনক্রমে যদি হরিদাস কাছছাড়া হয়, তবে তো কথাই নেই। তিন বোন ঘিরে বসে দু'জনকে।

পারুল বলে, রামকানাইদা—

রামকানাই সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, উহুঁ, দাদা নয়। তোমার বাবা বারণ করেছে। কাকা বল।

যুঁই বলে, রামকানাই কাকা—

বল।

বেলা বলে 'বল' বললেন কেন? বলুন, বল মা!

হাসতে গিয়ে হাসি আটকায় রামকানাইয়ের গলায়, বোকা বোকা হেসে বলে, হেঁ হেঁ, নিজের মাকে ছাড়া, মানে, কখনো কাউকে মানে—

মানের মানে সব চাপা পড়ে যায় হঠাৎ তিন মেয়ের গলার উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসিতে!

আবার আবির্ভাব হরিদাসের। কী ষড়যন্ত্রে মাতলো তিন মায়াবিণী।

তারপর আসে শিবু। অমনি বাকী তিনটি পুরুষের মুখে নামে অন্ধকার। দেখা দেয় বিরক্তি, বিকৃতি। মনে মনে ফোঁসে হরিদাস। মনে মনে সুতীক্ষ্ণ নখে নখ ঘসে আর বলে, শুয়োরের বাচ্চা!

আর তিন মেয়ে এবার সত্যি সত্যি চোখে হানে ঝিলিক। তিন বোনের নয়নজুলিতে, নিঃসৃত ঢল খাওয়া দেহ সরোবরে, লাগে ঢেউ টাবুটুবু পূর্ণ অষ্টাদশীর। এতক্ষণের বিদ্রূপ বেহায়াপনার পরে লজ্জা এসে ভারি করে ছয়টি চোখের পাতা। গালে ফোটে বিচিত্র রং, ঠোঁটে বিচিত্র রং, হাসি নাম-না-জানা। আড়ে আড়ে দেখে শিবুকে আর চোখোচোখি করে পরস্পর তিনবোনে। শিবু যেন নেশার ঘোরে মাতাল। না এসে পারেনা একবার। সে এলে হাওয়া বহে অন্যদিকে। পশ্চিমের বনশিউলী মেঘলাভাঙ্গা রোদের টোপর পরে যেন মুখ বাড়িয়ে ধরে অলিন্দে।

দক্ষিণের উঠোনে, ছাতিমের আয়তচোখের পাতা নড়ে রহস্যময়ীর মত। শিবুর কথা শুনেই পরিবেশ যায় পাল্টে। বলে, পড়তা খারাপ এ বছরের, বুঝলেন কাকাবাবু। মাত্তর দুটো বায়না মিলেছে, পৃথ্বিরাজ সংযুক্তার পৃথ্বিরাজ আর অর্জন, তাও অনেক কুতিয়ে কাতিয়ে। তবে পৃথ্বিরাজটা নতুন, সংযুক্তা হরণের সিন্‌টা। যদি মাৎ করতে পারি, জোর বায়না জুটবে।

তিন বোন নিঃশব্দ হাসিতে গড়িয়ে পড়ে গায়ে গায়ে। দাঁতে দাঁত ঘষে হাসে। বলে, তা ঠিক।

প্রতিধ্বনি করে দুই মাস্টার, হেঁ হেঁ!

শিবু বলে, নইলে মাইরী, মনমোহিনী অপেরার সঙ্গে চলে যাব, পাড়াগাঁয়ে।

বেলা বলে উদ্বেগচাপা গলায়, পাড়াগাঁয়ে?

শিবু বলে, হ্যাঁ। কি করব, বেকার তো থাকতে হবে না। আর পাড়াগাঁয়ের লোকগুলির ভাল লেগে গেলে, একটু খেতে টেতে দেয় ভাল।

অমনি তিনবোনের চোখে নামে অসময়ের মেঘ-অন্ধকার। হরিদাস বলে, সেই ভাল।

তবুও যুঁই বলে ঠোঁট উল্টে, আমরা বোধহয় চান্স পাব পাবলিক ষ্টেজে।

পারুল বলে, নয়তো ফিল্‌মে।

পরমুহূর্তেই বারুদের প্রথম জ্বালা নীল ঝিলিকের মত তীব্র বিদ্রূপ হাসি ফোটে তিনবোনের ঠোঁটে। হরিদাসের রক্তজলন্ত চোখ শাসায় নিঃশব্দে। যেন আরো কোণ্ ঘেঁষে ওৎ পাতে, শাণায় নখর।

কিন্তু অবাক ব্যপার! জ্বলন্ত চোখের শাসন, মেয়ে তিনটে দেখেও দেখেনা এখন। টেরে টেরে দেখে শিবুকে। হরিদাসের বুক কাঁপান হাসি দেখে কেন যে হাসে ওরা থেকে থেকে। যেন ওদের নিজেদের মধ্যে কি একটা জানাজানি আছে। দৈত্যের প্রাণ-ভোমরার খবরটা বলাবলি করে নাকি ওরা।

আরো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে হরিদাস। শিবু তখন বলে, আজ কি? চাণক্য? বলে বেলার সঙ্গে চাণক্যের অভিনয় করে। বেলা করে মুরা। তখন কেমন একটা চাপা-চাপা ব্যথা ও জ্বালা দেখা দেয় যুঁই ও পারুলের চোখে। সে খুবই ক্ষণিক। তারপরেই শিবু চন্দ্রগুপ্ত হয়ে প্রেম করে হেলেনের সঙ্গে। কর্তব্যরত প্রেমিক চন্দ্রগুপ্তের মত কাঁদায় ছায়াকে। পারুলের চোখে তখন সত্যি জল দেখা দেয়। এই সময়ে বোঝা যায়, অভিনয়ে দক্ষ কতখানি তিন বোনে। কিন্তু, শিবুর মত বোধহয় কেউ পারেনা সেই সোনারকাঠি ছোঁয়াতে। তারপরেও শিবু বলে, কাল কি? কিছু নয়? পরশু? তারপরে? দেবলাদেবী? মীরকাশিম? অদ্ভুত মুখস্ত তার। খিজির, কাফুর, আলাউদ্দীন, নয়তো মীরকাশিম, পিক্রুস্, মির্জাফর, তিনবোনের সঙ্গে সবগুলি প্রক্সি সে একা একা দেয়। প্রক্সি দেওয়ার জন্য কিনা কে জানে। কৃতজ্ঞতা ফোটে তিন-বোনের চোখে, কৃতজ্ঞতা যেন অনেকখানি অনুরাগে ভরা। তার ফাঁকে ফাঁকে ঐ বনশিউলীর বনের রোদে ছায়ার মত ব্যথার আনাগোনা। হঠাৎ মনে পড়ে, বোতাম খোলাবুকের। আঁচল আগোছালো। সাবান ঘষা মুখটা রয়েছে খস্‌খসে।

বেলা সন্তর্পণে চুল ওঠা কপাল ঢাকে। যুঁই লুকিয়ে দেখে তার বুকের অন্তর্বাস। দেখে পারুলও।

শিবু দেখে একে একে তিনজনকে। হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বাবা বলেছে, আমি নাকি আইবুড়ো বোনটার চেয়েও বড় কাঁটা। ঘাড় ধরে বার করে দেবে।

তারও চোখে ব্যথার ছায়া।

রান্নাঘরে বসে, শ্রীনগরের মুখুটিবাড়ির বড় বউয়ের ভয়ে হাত পা কাঁপে থরথর করে। শুধু ডাল পোড়ে উনুনে।

তারপর, বেলা না গড়াতেই সাজো সাজো রব। তাড়া দেয় হরিদাস। ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় বায়নার টাকা। কখনো পঁচিশ মাইল, কুড়ি মাইল, দশ মাইল দূরে। পাড়ার পাশের পাড়াতেও কখনো বা। সে এক বিচিত্র জগৎ। মানুষ যে কতরকম! কেউ গায়ে পড়ে চেহারা দেখায়। লোভ, রেষারেষি, অতি ভদ্রতার নাটুকেপনা। কোথায়ওবা অমুক জায়গার বিখ্যাত অ্যামেচার সামন্দেশ, মদ না খেয়ে পারে না পার্ট করতে, শুধু ঢলে ঢলে পড়েন ভাড়াটে অভিনেত্রীর ঘাড়ে।

হরিদাস এসব দেখে অন্য চোখে। তার যে এক ভয়। তাই সে মেয়েদের প্রতিই মনে মনে রোষে। টাকা নেয় হেসে।

রং মেখে ঢুলতে ঢুলতে রাত্রিশেষে ফিরে আসে তিনবোন। রাত্রিসন্ধ্যার গলায় সাজানো সতেজ, শেষরাত্রির পিষ্ট তিনটি মালা। ভাবে, যদি চিরদিন থাকত শুধু এই ঢুলুনি। এমনি নেশা নেশা ভাব। তবে তরে যাওয়া যেত। কিন্তু হয়না তা। সব পেরিয়েও সময় আসে। যখন হাসতে গিয়েও হঠাৎ থেমে যায় তিনজনে। হঠাৎ যেন অন্ধকার কোথা থেকে আসে ঘনিয়ে, বাতাস হয় রুদ্ধ একেবারে।

হয়তো চুল বাঁধতে বসে হঠাৎ চোখ দু'টো জ্বালা করে ওঠে বেলার। ঠোঁটে চেপে ধরে চিরুণী। জল দেখা দেয় চোখের কোণে। হঠাৎ কী যে হয়। হাতের স্নো মুখে না মেখেই, রুদ্ধ-গলায় ফিসফিস করে বলে যুঁই, তোর পায়ে পড়ি বড়দি, চোখ মুছে ফেল্। বলে সে নিজে স্নো ভরা হাত চাপা দেয় চোখে।

আল্‌তার বাটি থেকে আল্‌তা পড়ে ছল্‌কে। বেলার পায়ের কাছে মুখ চেপে ফুলেফুলে ওঠে পারুল। বলে, কেন যে কাঁদিস্ তোরা। কী যে হয়। কেন যে হয়!

অনেক সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলতে চলতেও এড়াতে পারেনা এটুকু। অকস্মাৎ শক্ত শিলায় কখন চিড়খেয়ে যায়। এ ওকে সামলাতে গিয়ে ফুটিফাটা হয় তিনজনার।

পশ্চিমের শিউলী বনটা তখন রৌদ্রহারা, ঘনছায়া বিষণ্ণ বাতাসে হু-হু করে। দক্ষিণের গোলাকৃতি ছাতিম সরে গিয়ে পুরানো রাজবাড়ির কোণে মুখ গোঁজে।

নিশ্বাস ঝরে বেলার। বলে, কী যে হয়।

যুঁই বলে, পোড়ে মনের মধ্যে।

পারুল বলে আলুথালু বেশে, আমার সারাগায়ের মধ্যে যেন কি পাক দিয়ে ওঠে।

বেলা বলে, কিছু যেন মনে পড়ে?

কী? কাকে মনে পড়ে? তিনজনে তাকায় তিনজনের চোখের দিকে। কাকে যেন খোঁজে পরস্পরের চোখে।

তবু আবার হাসে তিনবোনে। ভাসে নিত্য জীবনে। ধনুকের ছিলার মত বেঁকে ওঠে ঠোঁট। চোখের বিদ্যুতে, হাসির বজ্রে জ্বালাতে চায় সংসারটাকে। কখনো কখনো জ্বলে ওঠে নির্দয়ভাবে। হয়তো অন্ধরাত্রে, বিছানায় পাশাপাশি দেহলগ্ন হয়ে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। নেমে আসে নড়বড়ে ছাদটা। অন্ধকারকে পিষে অন্ধকার। দম বন্ধ হয়ে আসে। এই দেহ যেন পিন্ ফোটা শির। রক্ত ঝরে অহর্নিশ। প্রাণ-স্রোত গলে গলে অবসাদে হয় শীর্ণ শব। নিত্য জোয়ারে প্লাবিত গঙ্গায় ও সুদীর্ঘ সময়ের নামে ভাঁটা। পাতালবাসিনীর মত হয়তো চাপা গলায় গর্জে ওঠে বেলা, কেন, কিসের জন্য? আর কিছু কি নেই, আর কোন সুখদুঃখ বুঝি নেই সংসারে? শুধু এই রংমাখা মুখে?

নিজেদেরই মনের ভাষাকে আরো শাণিত করতে, পাল্টা যুক্তি দেয় যুঁই, এই দুদিন। বাবা, মা, ভাই, বোন·········

বেলা বলে, এই কি রীতি সংসারের? চিরদিন সেইজন্য রং মাখতে হবে মুখে। শুধু ভাই বোন মা? মেয়েমানুষের আর কিছু থাকে না সংসারে? থাকে না আর কিছু?

পারুল বলে, আমরা বুঝি মেয়ে নই বাবা মায়ের? শুধু তারাই বাপ-মা? আমাদের দেবে না কিছুই?

কিছু কী? যুঁই অন্ধকারে চেয়ে থাকে নির্বাক হয়ে। তারও মন জ্বলে। তারপর তিনজনেই চুপ হয়ে যায়। চোখ জ্বলে আর ভিজে ভিজে ওঠে। দক্ষিণের ছাতিমের ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ টেনে টেনে কাঁদে। অন্ধকার মনে মনে বলে, রিক্ত মাঠের বুকে অসহ্য বেদনা জাগে সৃষ্টিহীন অপমানে। আরো কত মানুষ সংসারে! কত দূর ব্যাপ্ত ছোটখাট সুখে দুঃখে, মহান হাসি ও কান্নায় সম্পূর্ণ সংসারটা ছড়ানো স্তরে স্তরে। কে না চায় নিজেকে ছড়াতে, ছাড়াতে? অবহেলিত বনলতাও সর্বশক্তিমান মানুষের বেড়া টপকে বাড়ে অবিরত। এই তো নিয়ম।

নেমে আসে ছাদ। চাপা দেয়, পিষ্ট করে। বুকে মুখে পড়ে থাকে তিনজনে।

সকালে হরিদাস গোনে, এক, দুই, তিন······। পোকা খাওয়া চোখে দেখে দক্ষিণে পশ্চিমে। মরসুম। মরসুম।

স্নেহলতা রাগে ভয়ে পোড়ে।

মরসুম! মরসুম! বহু রাত্রি ভোর হয়। আবার রাত্রি ভোর হয়।

দরজা ঠেলে হরিদাস। দরজা ককিয়ে ওঠে, ব্যাথা জাগা গর্ভিনী মার্জারীর মত। হরিদাস গোনে, এক, দুই, তিন—

অভ্যাসে গুনেছে। হঠাৎ থেমে গোনে আবার, এক, দুই······ দুটি রং মাখা মুখ। অসাড় নিদ্রায় মগ্ন।

নিশাচর রক্তচোখ ঘষে হরিদাস দেখে, একজন নেই। কে? যুঁই। কোথায় গেল? দেখে এদিক ওদিক। পশ্চিমে বনশিউলী-বনে থোকো থোকো তাজা ফুল হাসছে রোদ ঠোঁটে নিয়ে। মাথা চাড়া দেওয়া রাংচিতে উঠেছে আকাশে। যুঁই কোথায়? উপরে নীচে নেই, আশেপাশে নেই। হরিদাস ডেকে তোলে দুজনকে। যুঁই কোথায়?

রং ওঠা-ওঠা দুটি মুখ, ভাবলেশহীন। কাজলঅন্ধ রাতজাগা চোখে তাকায় বিছানার দিকে। যেখানে শুয়েছিল আর একজন, ছিল তিনজন দেহলগ্ন হয়ে। হঠাৎ যেন মাটি আর বিচুলি বেরিয়ে পড়ে রংমাখা পুতুলের মুখে। চোখ নেই, দেওয়ালের গর্তের মত শুধু কালো কালো ফুটো চারটে চোখ। বিস্মিত কান্নায় তারা দুজনেই পাল্টা জিজ্ঞেস করে, কোথায়, কোথায়?

আচমকা টনক নড়ে দৈত্যের। ডানাখসা প্রাণভোমরা গোঙায় রাগে ও ভয়ে। কঠিন শিকলে বাঁধা অনায়াস জীবনে ধরেছে ফাটল। ওপড়ানো শিকড় বৃদ্ধ বট টলমল করে। আতঙ্কে ও ঘৃণায় চীৎকার করে ওঠে হরিদাস, কোথায়? কোথায়?

পলাতকার পদচিহ্নের মত, একটুকরো কাগজ বেরোয় বালিশের তলা থেকে। বিস্মিত-আক্রোশ-জ্বলন্ত চোখে কাগজটি পড়ে বেলা। পড়ে দেয় পারুলের হাতে। আচমকা আগুন লাগে পারুলের গায়ে কাগজটি পড়ে। অভিশাপের আগুনে চিরকুটটি পুড়িয়ে দেয় হরিদাসের হাতে। হরিদাস পড়ে, 'অকারণ খুঁজোনা। চলে গেলাম শিবুর সঙ্গে।'

ঘরটা যেন টাল খেয়ে গেল। নীরবতা কয়েক মুহূর্ত। চায়ের গেলাস কেৎলী হাতে দরজার কাছে বোবা ছবি স্নেহলতা। বাদ-বাকী ছেলেমেয়েগুলি উঁকি দেয় নানান্ ঘুলঘুলি দিয়ে।

হরিদাসের রক্তচোখ সাঁড়াশীর মত নেমে আসে বাকী দুটি মুখের উপর।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, ফিরে তাকায় বেলা। চোখ জ্বলে

তার। গলায় অজস্র ঘৃণা ঢেলে বলে, জানো বাবা, আরো কি বলত যুঁই ?

ছিন্নসূত্র খুঁজে পাওয়া চকিত সন্ধানী গলায় বলে হরিদাস, কি ?

কি ? সত্যি আরো কি বলত যুঁই, বেলা কি জানে ? সে কি মিথ্যাকথা বলছে ? হয় তো আপন মনে তৈরী করা, তবু অসহ্য ঘৃণাভরে বলে, জানো বাবা, বলত চিরদিন কি রং মাখব মুখে ? যদি বা মাখি, আর কি নেই কিছু আমার প্রাণে ?

হরিদাস রুদ্ধগলায় বলে, আর ? আর কি ?

আর ? হঠাৎ যেন ভুলে যায় সব কথা। অমনি মনে হয়, যুঁই যেন তার কানে কানে কথা বলছে। যেন যুঁইয়ের সেই শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলিই বলে, আর ? আর বলত, 'না হয় খাবো দুঃখের ভাত, পরব ছেঁড়া কাপড়, তবু সে তো আমারি দুঃখের ঘরে।'

পারুলও বলে ওঠে তিক্ত ঝাঁজ গলায়, আরো কি বলত, জানো মেসোমশাই ?

হরিদাসের চোখ ফেটে পড়ে। শির ছেঁড়া গলায় বলে, কি, কি ?

পারুলের মনে হয়না একটুও বানিয়ে বলছে। বলে, বলত, 'আমার ঘর হবে, স্বামী হবে, ছেলে হবে। রাতভর নাটক করে ফিরে এসে, রাঁধব, খাওয়াব ওকে, ঘুম পাড়াব......'

কণ্ঠরুদ্ধ হয় পারুলের। তবু বলে, আর বলত, 'বাবা যদি চায়, বাবাকেও দেব। তবু এখানে আর পারিনে। এবার চলে যাব।'

বেলা পারুল দুজনেই ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ, বলত।

হরিদাস বলে, তোরা কি বলতিস ?

আমরা ? হঠাৎ দুর্জয় জ্বলন্ত চোখ ফেটে জল আসে দুজনেরই। রং ধুয়ে যায় গালের। দুজনেই বলে, আমরা ? আমরা বলতাম, না না, কখনো না।

হরিদাস চীৎকার করে প্রতিধ্বনি করে, না না, কখনো না।

ছোট হয়ে আসে ঘরটা, ভারি হয়ে আসে অন্ধকার। ঝুলগুলি নেমে আসে কড়িকাঠ থেকে মেঝেয়।

তবু বন শিউলী বনে ফোটা দৃপ্ত সতেজ ফুলগুলি রোদে হাসে, মাথা দোলায় বাতাসে। রাংচিতের নরম ডাঁটা আকাশকে ছাড়াতে চায় তরতর করে।

তারপর নজর ফেরে হরিদাসের স্নেহলতার দিকে। ভয় ঘৃণা কান্না, কিছুই ছিলনা তার চোখে। ভাবলেশহীন চোখ দুটি তার। যেন চেয়েছিল নিজের হাতের পঁচিশ বছরের পুরণো, জললাগা, ধুলো লাগা, তেল লাগা, শাঁখার দিকে। হরিদাস দেখে তার সিঁদুর লেপা মধ্যসিঁথি।

দেখে, তার ক্রুদ্ধচোখ হঠাৎ চমকায়। যেন চোখ দুটি অন্ধ হয়ে যায়। ফিরে চায় নতুন সন্দেহে। মনে হয়, সামনে দাঁড়িয়ে ওটা যুঁই। স্নেহলতা নয়। পালাবার ছলনা যার চোখের ছায়ায় অনেক, অনেক আগে হরিদাস দেখতে পেয়েছিল।